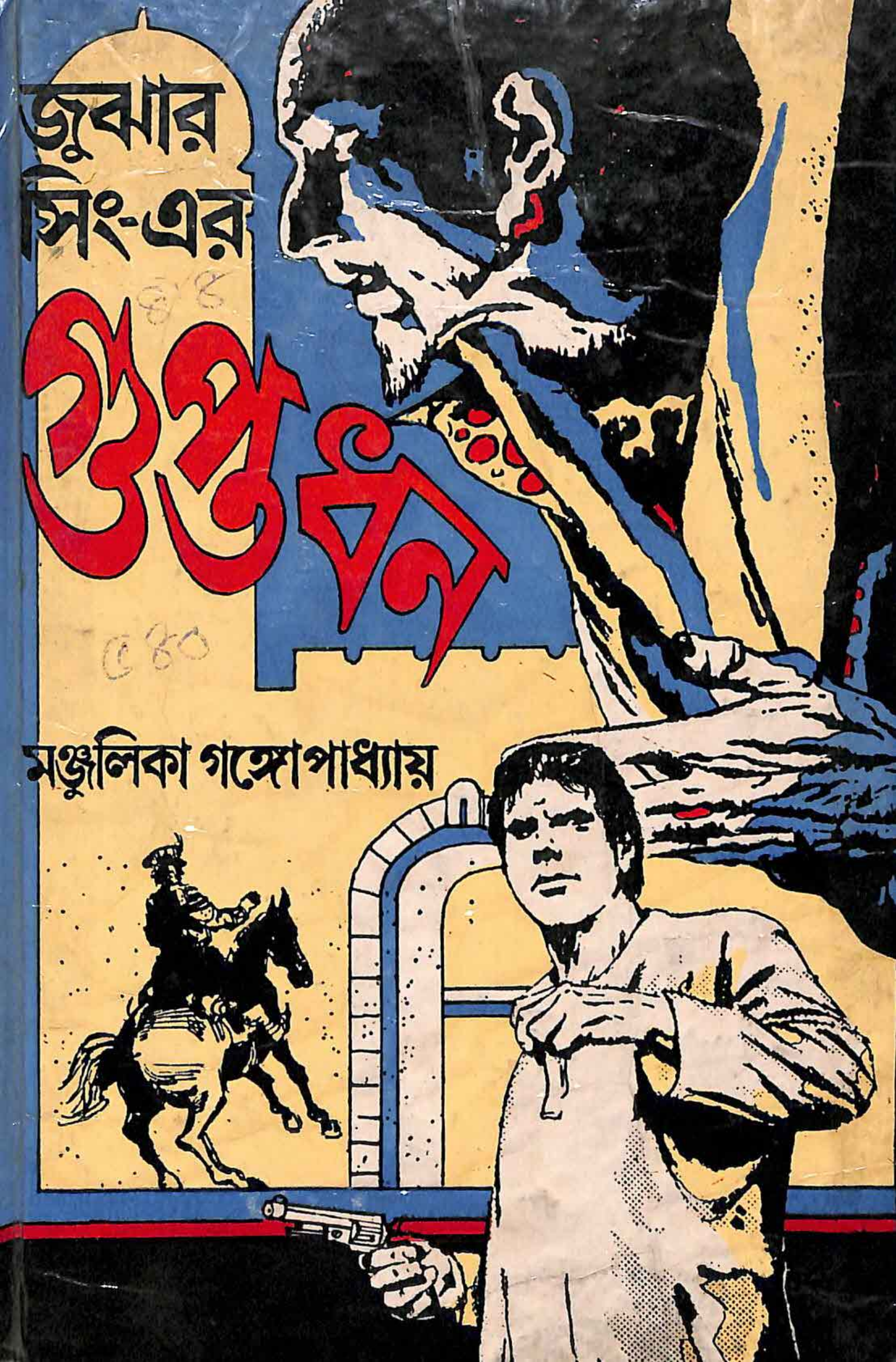

জুঝার
সিং-এর
গুপ্তধন
মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

জুঝার সিং-এর গুপ্তধন

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭/সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুলাই, ১৯৮৭

প্রকাশক
সি. ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫-এ, অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য—দশ টাকা

স্বর্গগত বাবা এবং স্বর্গগতা মায়ের উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করলাম।

জুঝার সিং-এর গুপ্তধন

সামান্য কথা—

বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, শুধু বিশাল নয় এর ইতিহাসও অতি প্রাচীন। তাই এর প্রতিটি স্থানে লেখা হয়ে আছে নানা ঘটনা, নানা কাহিনী। এইসব সত্য ঘটনা বা কাহিনী রূপকথার গল্পের থেকেও আকর্ষণীয়।

আমার এই কাহিনীর পটভূমি বুন্দেলখণ্ড। যেখানকার হিন্দু রাজারা এক সময় বীরত্বের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদেরই এক একজনের জীবনী নিয়ে যদি লেখা যায় তবে তা যেমন হবে বীরত্বব্যঞ্জক তেমনি হবে রোমাঞ্চকর।

আমি ইতিহাস লিখতে বসিনি, তবু ইতিহাসের ভূমিকা একেবারে নগণ্য নয়। বীরসিং, জুঝার সিং, হরদৌল এঁরা কিন্তু কেউই কাল্পনিক নন, রীতিমত ঐতিহাসিক পুরুষ। আজও ওর্ছায় গেলে দেখা যাবে 'হরদৌলের চবুতরায়' পুজো প'ড়ছে কিম্বা ঘুমপাড়ানি ছড়ায় গাইছে—

"জেঠ জুঝার রাই রণধীর। পুণি হরদৌল বুদ্ধি গম্ভীর।"

রাজা রাজড়াদের লোভ; ঈর্ষা, প্রতিহিংসা যে কত মারাত্মক হতো এ তারই একটি কাহিনী।

১০, বর্ধমান রোড
আলিপুর
কলকাতা-৭০০০২৭

বিনীতা
মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্বিন, ১৩৮৯

মহফিল বসেছে। ক্রমে ক্রমে জমে উঠছে সভা। ঝাড়বাতির ঠিন-ঠিনি, তানপুরার রিনঝিনি আর সারেঙ্গীর ছড়ের মৃদু টানেই বাতাস যেন সুরেলা হয়ে উঠেছে। যদিও আজ যমুনা বাঈ বা দিলদার জানের কণ্ঠের যাদু আলহিয়া বিলাবল বা বসন্তবাহার নিয়ে খেলা শুরু করবে না।

কি আশ্চর্য লাগছে?

না না আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ওর্ছায় বুন্দেলা রাজাদের বংশধরেরা মাঝে মাঝেই মহফিল বসান। গড়গড়া, গোলাপ জল, ঠাণ্ডাই—সব আছে। অম্বুরি তামাকের গন্ধে আজও চারিধারে মোহজাল সৃষ্টি করে।

বয়স বেড়েছে সকলেরই। বুড়ো বাহাদুর খাঁ-এর বয়সই যদি হিসাব করা হয়—তা প্রায় আশী হবে। এমনিতে হাত কাঁপে, কিন্তু যখন গিলে করা পাঞ্জাবির সঙ্গে চোস্ত পরে, শুভ্র কেশে সাদা টুপি মাথায় সভায় এসে বসেন, তখন কোথায় যায় হাতের কাঁপুনি, শিক্ষিত হাতে তুলে নেন সারেঙ্গী আর যাদুমন্ত্র ছড়িয়ে দেন শ্রোতার কানে।

বীরেন্দ্র সিং সভায় এসে বসলেন।

ধীরে ধীরে সভা জমে ওঠে। যমুনা বাঈ বা দিলদার জান না এলেও আজ যিনি তসরিব রেখেছেন তিনি 'মস্থর' গায়িকা নাসিম সুলতানা, এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে। অবশ্য বীরেন্দ্র সিং-এর নিমন্ত্রণেই তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে আসেননি, এসেছেন টিকমগড়ের রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষে গান করতে। সেই সময় বীরেন্দ্র সিং তাঁকে মুজরো দিয়েছিলেন যদিও নাসিম সুলতানা রাজি ছিলেন না কারণ পান্না স্টেটে তাঁর আগে থেকেই বায়না নেওয়া ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন।

জমজমাট সভা। আমন্ত্রিতের সংখ্যা অন্যবারের তুলনায় এবার অনেক বেশী। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার গাইয়ে তো আর সর্বদা আসে না।

বৃদ্ধ ভৃত্য চমনলাল খুশী। তার যে এখানে কত যুগ হয়ে গেছে তার হিসেব সে নিজেই রাখতে পারে না। বাবা মুনিমলালের হাত ধরে নেহাৎ আট বছর বয়সে এসেছিল ওহ্‌্যার রাজ বাড়িতে। তখন বীরেন্দ্রের বাবা নগেন্দ্ররই ছিল ছেলে মানুষ। ক্রমশ সে নগেন্দ্রের খাস চাকর হয়েছিল। চমনলাল প্রায়ই দুঃখ করে বলে—রাজাজীর সময় যেমন মহফিল করতেন তেমনটা আর হয় না।

বীরেন্দ্র হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন—এই যে গানের আসর বসে, একে কি তুমি মহফিল বলবে না ?

—মহফিল হয়তো, কিন্তু বড়ো সাদা মাটা, বড়ো জৌলুসহীন। আর আগে……!

ব'লতে ব'লতে চমনলালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

চমনলালের মনটা আজ কিন্তু খুশী খুশী। আতর নিয়ে ঘুরছে। কখনো গোলাপ পাস থেকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, কখনও বাদামের শরবৎ বা ঠাণ্ডাই এনে এনে ধ'রেছে শ্রোতাদের সামনে।

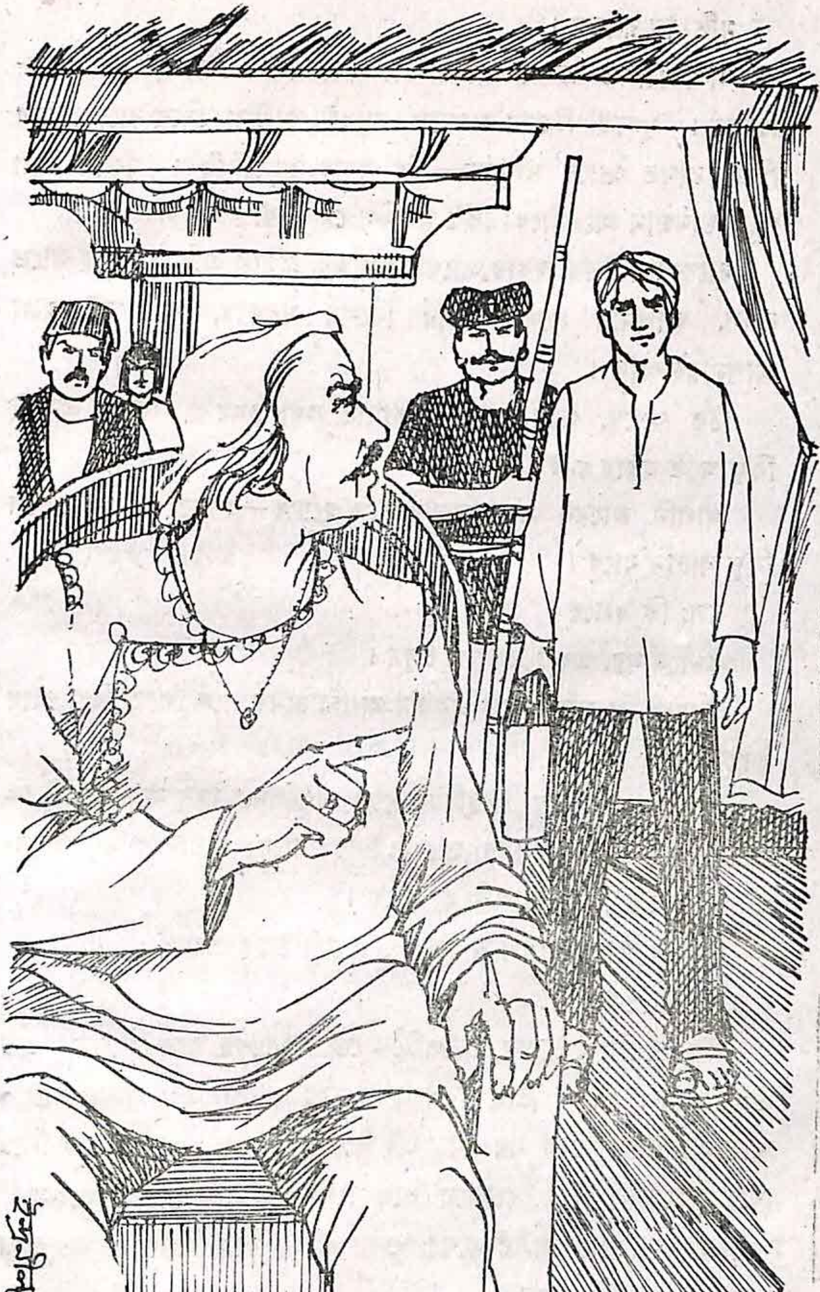
এতক্ষণ চলছিল বাহাদুর খাঁর সারেঙ্গী। এবার সভায় প্রবেশ করলেন নাসিম সুলতানা। সুরের যাদু তো পরের কথা, রূপের ঝলকেই উপস্থিত শ্রোতারা চমকে উঠলেন।

আকাশ নীল শাড়িতে চুমকিগুলো তারার মত ফুটে আছে। যথা-বিহিত কুর্নিশ ইত্যাদি করে গান ধরলেন নাসিম। শুরু হলো ইমন কল্যাণ। রাগ-রাগিণীর জানা অজানা পথ দিয়ে শ্রোতাদের যেন অন্য কোন রাজ্যে নিয়ে চললেন তিনি।

সকলেই তন্ময়, মুগ্ধ, আত্মহারা।

এক সময় গান শেষ হলো, কিন্তু গানের রেশ তখনো সভায় চাঁদোয়ার মত দুলতে লাগল। প্রত্যেকেই সেই আমেজ অনুভব করতে থাকেন।

ঠিক তখনই ঝাঁকড়া চুল, আধ ময়লা কাপড় পরা এক যুবক দারোয়ানের সঙ্গে সভায় ঢুকল।



মূর্তিমান রসভঙ্গ।

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বীরেন্দ্র সিং প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। মুহূর্তে নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে দারোয়ানের দিকে রাগত ভাবে বললেন—এহ্ ক্যায় বদ্‌তমিজি? মুঝসে বিনা পুছে আনজান আদমীকো কিউ মহফিল মে লায়া?

দারোয়ান উত্তর দেবার আগেই আগন্তুক এগিয়ে এসে ভাঙ্গা হিন্দীতে বলল, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার, সময় নষ্ট হলে আপনারই ক্ষতি।

ঠিক আছে, সভা ভাঙলে তোমার কথা শুনব। আমার এখনই কিছু ক্ষতি হবার নেই।

আপনি জানেন না, অনেক ক্ষতি হয়েছে—হয়তো এখনো শুনলে কিছু বাঁচান যাবে।

বল, কি বলবে।

এখানে নয়, একটু একান্তে, চলুন।

বীরেন্দ্র সিং সভা ছেড়ে একজন অপরিচিতের সঙ্গে যেতে দ্বিধা বোধ করলেন।

অভ্যাগতরা তাঁর অসুবিধা বুঝে বললেন, যান না, ছেলেটি কি বলছে, শুনে আসুন, আমরা ততক্ষণ উদয়প্রসাদের সরোদ শুনি···অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

আমার আবার আপত্তি কিসের, এ তো উত্তম প্রস্তাব।

বাজনা শুরু হল।

বীরেন্দ্র সিং ইশারায় ছেলেটিকে ডেকে পাশের ঘরে গেলেন। এটি তাঁর অফিস ঘর। তাঁর বিশাল কাঠের ব্যবসা এবং পাথর কাটার খাদান আছে। সেই সব কাজ এই ঘরে বসেই হয়। ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নির্দিষ্ট চেয়ারে নিজে বসে ছেলেটিকে বসতে বললেন।

এক লহমা ছেলেটির মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, বল, কি বলবে।

ছেলেটি হাতে ধরা নতুন একটি ব্যাগ থেকে কি যেন টেনে বার করতে লাগল। তার কাপড়-জামার সঙ্গে নতুন ব্যাগটা বেখাপ্পা রকমের তফাত।

ইতিমধ্যে ছেলেটি প্লাষ্টিকের খাতার মলাটের মত কি একটা টেনে বার করল। বীরেন্দ্র দেখলেন, সে খুব সাবধানে সব কিছু করছে। এরপর সেই খাতাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

কি করব?

খুলে দেখুন না।

বীরেন্দ্রও সাবধানেই খুললেন, দেখলেন একটা নক্শা; কবেকার কে জানে, একেবারে বিবর্ণ।

এটা কি?

গুপ্তধন।

বীরেন্দ্র অট্টহাস্য করে উঠে বললেন, ভাল, কবে এটা উদ্ধার করতে যেতে হবে?

মনে মনে বললেন, এ তো পুরো পাগল, এখন এর হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।

দেখুন, আপনি এটার গুরুত্ব দিচ্ছেন না, কিন্তু একটু সময় দিলে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব। এ সবই আপনার পূর্বপুরুষের গচ্ছিত সম্পত্তি।

বুঝতে পারছি, তোমার কিছু সাহায্য প্রয়োজন।

আমার কোন সাহায্য প্রয়োজন নেই, বরং আপনারই প্রয়োজন আছে আমার সাহায্যের।

বীরেন্দ্র সিংয়ের মুখের হাসি মেলায় নি তখনো; কৌতুকভরে বললেন, তাই নাকি! তবে তো তোমাকে খাতির করা উচিত।

ছেলেটি সে কথায় কান দিল না। সে ব্যাগের মধ্যে কিছু খুঁজতে শুরু করল—মুখে বেশ সংশয়ের ছায়া ভাসতে লাগল। হঠাৎ

তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—বীরেন্দ্র নিবিষ্ট মনে সব লক্ষ্য করছিলেন।

ছেলেটি কাগজের মোড়ক থেকে একটি আংটি বার করে বীরেন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র চমকে উঠলেন। এ কী করে সম্ভব? তাঁদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত আংটির মত আংটি অতি সাধারণ এই ছেলেটি পেল কি করে? তবে কি দেওয়ালের গায়ে লাগান গুপ্ত সিন্দুক থেকে সে আংটি চুরি গেছে? কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। মাত্র ক'দিন আগে ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই তিনি সিন্দুক খুলেছিলেন, তখন দেখে-ছিলেন বংশের চিহ্ন এই আংটি, মাথার তাজ ইত্যাদি সব রয়েছে।

ওই সিন্দুক খোলাও তো এক সমস্যা। পালঙ্ক সরিয়ে, তবে খুলতে হয়। বিশাল পালঙ্ক সরানো কোন সাধারণ চোরের কাজ নয়।

ছেলেটি এবার দু-চোখে কৌতুকের রশ্মি ছড়িয়ে বলল, কি, চিনতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, পারছি। কিন্তু এ জিনিস তুমি পেলে কি করে? ঠিক কথা বল, নাহলে তোমাকে পুলিশে দেব।

এবার ছেলেটি হেসে উঠল। বলল, আরে, আপনি এইটুকুতেই এত অধীর হচ্ছেন···

এইটুকু মানে? জান, এই রক্তমুখী নীলার আংটির দাম কত?

এইটুকু দামেই চমকাবেন না। এমনি শত শত নীলা, হীরা, মণি-মাণিক্য আপনি পাবেন, তারই হদিস দিতে এসেছি। আর হ্যাঁ, পুলিশের কথা বলছিলেন না? তাকে তো খবর দিতেই হবে, আমাদের একার পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হবে না।

এত কথা শুনতে চাই না, আসল কথা বল।

দেখুন মিস্টার সিং, এত অধৈর্য হলে হবে না, অনেক সময় লাগবে। আপনি বরং সভা শেষ করে আসুন। আর যদি কিছু না মনে করেন

তবে আপনার কোন লোককে বলে দিন, আমার স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দেবে। অনেক দূর থেকে আসছি, বড় ক্লান্ত…

ছি ছি, আমারই ভুল—আমি এখনই বলছি।

বীরেন্দ্র সিং উঠে পড়লেন, একটু আগের উৎফুল্ল মুখটা চিন্তায় কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, সেজন্য পদক্ষেপটাও বেশ ভারি।

নিঃশব্দে তিনি চমনলালের কাছে এসে কিছু নির্দেশ দিয়ে সভায় গেলেন। বাদক তখন সমাপ্তির মুখে এসেছে। বাজনাও বেশ জমেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বাজনা থামল। বীরেন্দ্র সিং সুরের রেশটা কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল পাশের শহর বরওয়ারের ছত্তর পাল তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন চাইছে ওর অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে ফেলতে। চোখে চোখ পড়তেই সে যেন কেমন অপ্রস্তুতভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

বীরেন্দ্রর মনে হল, হঠাৎ যেন একটা রহস্যের জাল তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। মনে জোর আনার চেষ্টা করলেন—প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা মার্কেণ্ডেয়ই তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

বীরেন্দ্র সিংয়ের জ্ঞাতি ভাই বীর সিং প্রথম উঠলেন। বললেন, আজ চলি, একটু কাজ আছে।

বীরেন্দ্র মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, আরে ভাইসাহেব, তুমি আজ এত তাড়া করছ কেন?

আর বলিস কেন, ওকালতি করার মুশকিল এই, নিজের সাধ-ইচ্ছে কিছুই থাকে না, পরের সুখ-সুবিধে দেখতে গিয়ে।

বীর সিং যাবার পর থেকে এক এক করে সকলে যেতে আরম্ভ করলেন। মনে অধৈর্য হলেও বীরেন্দ্র মুখে হাসি লাগিয়ে রাখলেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ঘড়ির আওয়াজের মত একই চিন্তা টিক্‌টিক্ করে চলেছে—কে এই ছেলেটি? কি জানে সে? হঠাৎ উদয়ই বা হল কোথা থেকে? নামটা তো জানা হয় নি।

সভা ফাঁকা হলে বীরেন্দ্র ছেলেটির উদ্দেশে পা চালালেন। নাচঘর পেরিয়ে দালানে পড়লেন। সেটা পেরিয়ে বারবাড়িতে ছেলেটির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ওপরের দালান থেকে নিচের দিকে দৃষ্টি যেতেই বীরেন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, ছত্তর পাল এবং নায়েব হরবংশ সিং আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি যেন কথা বলছেন।

হরবংশের সঙ্গে ছত্তরের কোন গোপন কথা থাকা সম্ভব নয়, কারণ না মান্যে, না বয়সে দুজনের মিল আছে, হয়তো স্বভাবের মিল থাকতে পারে।

ছত্তরের ঈর্ষাকাতর স্বভাবের পরিচয় দু-একবার বীরেন্দ্র পেয়েছেন, প্রথম, টিকমগড়ে ওর বিয়ের ঠিক হওয়ায়, ভাংচি দিল। পরে জানা গিয়েছিল, এর পিছনে ছত্তর পাল ছিল। দ্বিতীয়বার, তখন বীরেন্দ্র পাথর কাটার কাজ নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল, তখন কুলিদের ওর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে বিব্রত করেছিল। কিন্তু এখন কি?

বীরেন্দ্র থেমে যাওয়া পায়ে আবার গতি আনলেন, কিন্তু মাথাটা ভার মনে হল। উনি যত চান হালকা ভাবে জীবন কাটাতে, ততই যেন নানা চিন্তা ওঁকে ঘিরে ধরে। এ ছেলেটাই বা কে? এও কি ছত্তর পালের চাল নাকি?

নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে বীরেন্দ্র ছেলেটিকে চিনতেই পারেন নি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষায় সে যেন অন্য মানুষ।

বীরেন্দ্রকে দেখে সলজ্জ হেসে ছেলেটি বলল, ক'দিন ট্রেন আর বাস জার্নি করে ভীষণ অপরিষ্কার লাগছিল, এখন স্নান করে বেশ ভাল লাগছে।

ছেলেটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বীরেন্দ্র বললেন, আরে, বোসো, বোসো, আমার সঙ্গে ফর্মালিটি করার দরকার নেই।···কি নাম তোমার?

আদিত্য রায়।

তুমি বাঙালী নাকি?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

এবার বল, কি তোমার বক্তব্য···হ্যাঁ, তার আগে জিজ্ঞেস করি, তোমাকে খেতে-টেতে দিয়েছে তো ?

হ্যাঁ, সে সব পাট রাজসিক ভাবেই চুকেছে।

এই আংটিই বা পেলে কি করে, আর এই পুরোনো নক্‌শাই বা কি জন্যে ?

বীরেন্দ্রবাবু, এর পেছনে বিরাট এক কাহিনী আছে, সেটা পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন।

ছেলেটি উঠে টেবিলে রাখা তার ব্যাগটি থেকে সন্তর্পণে একটি বিবর্ণ টিনের বাক্স বার করল—ছোট খাতার সাইজের। সেটা খুলে তুলোট কাগজে লেখা একটি খাতার মত বার করলেন। সাবধানে কয়েক পাতা উল্টে দেখলেন। লেখাটি শুধু বিবর্ণ নয়, কোন সময় জলে পড়ে যায়, তাই অনেক অক্ষর ধুয়ে ধুয়ে গেছে, তবে অনেক জায়গায় নতুন করে অক্ষর বসিয়ে সাজান হয়েছে।

এই জরাজীর্ণ লেখা উদ্ধার করতে বীরেন্দ্রর একেবারেই ইচ্ছা করছিল না, তাই ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, তুমিই বল না হে, কি ব্যাপার। এ সব পড়ে কি হবে ?

বীরেন্দ্রবাবু, আমি নিজে বুন্দেলখণ্ডি ভাষা ভাল জানিও না, আর পড়তেও পারি না। এটা আপনার দরকার। যিনি আমাকে এটা দিয়েছিলেন, তিনি বিশেষ কিছু বলে যেতে পারেননি। তাই এটা না পড়লে, জানা যাবে না।

অগত্যা বীরেন্দ্র পুরোনো কাগজে মন দিলেন। প্রথম পাতার ডান দিকে দেখলেন, তারিখ দেওয়া রয়েছে, কার্তিক, ১৬৩৫ সন। চিঠির মাথায়—নমঃ পরমেশ্বরায় নমঃ। চিঠিটি নির্দিষ্ট কারোর উদ্দেশ্যে লেখা নয়, এইভাবে শুরু :

আমার আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্যে আমি লিখছি না। লিখছি এই জন্যে, যাতে আমার বংশধররা জানতে পারে, এই সম্পত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকার আছে। জানি না, কবে বা কিভাবে এই দলিল আর নক্‌শা আমার বংশধরের হাতে পড়বে।

আজ—আমি, আমি কেন আমরা, রাজ্যহীন, বনচারী। মোঘল সেনারা আমাদের পিছনে সন্ধানী শিকারীর মত লেগে আছে। জানি না, কোনদিন হৃতরাজ্যে ফিরে যেতে পারব কিনা। আমার এই গোপন নথিপত্র তাই আমার একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর উদয়ভানুকে দিলাম। যদি আমি বা আমার ছেলে বিক্রমজিৎ ওর্ছায় ফিরি আর গদিতে বসি, তবে আমাদের ফিরিয়ে দেবে, নাহলে আমার বংশধর যে থাকবে, তাকেই দেবে।

এই পর্যন্ত পড়ে বীরেন্দ্র মুখ তুললেন। বললেন, এ তো দেখছি, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগের লেখা। এ তুমি কার কাছ থেকে পেলে ?

এক সাধুর কাছ থেকে। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়· ·সে সব পরে বলব, আপনি আগে পড়া শেষ করুন। এ ছাড়াও অনেক কথা আছে। আপনি পড়ুন।

বীরেন্দ্র বললেন, আমি পড়ব আর তুমি বসে থাকবে, আমার বিশ্রী লাগছে।

ঠিক আছে, আপনি পড়ুন, আমি ততক্ষণ একটা বই পড়ছি।

বীরেন্দ্র পাতাগুলো দ্রুত উল্টে শেষ পাতায় এলেন। বাসনা, লেখকের নাম দেখা। জুঝার সিং ঃ নামটা দেখে চমকে উঠলেন। বীরেন্দ্রের উর্ধ্বতন পুরুষ। আজ থেকে তিনশো বছর আগে, যাঁর দাপট মোঘল সম্রাটের কপালে বলিরেখা ফেলেছিল।

আর কোন কথা না বলে পড়ায় ডুব দিলেন। আর যেন সত্যি সত্যিই চলে গেলেন কয়েক শতাব্দী আগের বুন্দেলখণ্ডে। শুনতে পেলেন ঘোড়ার খুরের ধ্বনি···তরবারির ঝনঝনা।

···ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোহনপাল বুন্দেলখণ্ডে ছোট্ট একটি রাজ্য স্থাপন করলেন, নাম দিলেন বুন্দেলখণ্ড। সময় গড়িয়ে গেল আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখল। যেহেতু ছোট্ট জায়গীর, তাই বড় শক্তির চোখ এড়িয়ে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখল। ষোড়শ শতাব্দীতে এলেন রুদ্রপ্রতাপ। তিনি ওর্ছায় রাজধানী স্থাপন করলেন।

রুদ্রপ্রতাপের মধ্যম পুত্র মধুকর শাহ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় সব বুন্দেলখণ্ডিকে একত্রিত করে মোঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। দুঃখের বিষয়, এই বিদ্রোহ বিশেষ ফলপ্রসূ হল না। তখন স্বয়ং আকবর দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি শক্ত হাতে মধুকর শাহকে দমন করে, করদ রাজ্য করলেন। শুধু তাই নয়, বেশ কড়া নজর রাখলেন। ফলে মধুকর শাহের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য বাড়ল না। মনের আশা মনেই রয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন।

তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে রাজা রামচন্দ্র বা রাম শা। তিনি ছিলেন বাবার প্রকৃতির বিপরীত, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন নেহাৎই সাধারণ। দ্বিতীয় পুত্র বীর সিং উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন না পেলেও পিতার মত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার স্বভাব পেয়েছিলেন।

বড় ভাই ওর্ছার সিংহাসনে বসলে, বীর সিং দস্যুর মুক্ত জীবন বেছে নিলেন। প্রতিদিনের রোমাঞ্চই তাঁর কাম্য ছিল।

ঠিক এই সময়েই বীর সিংহের ভাগ্য রবি উঁকি দিলেন। আকবরের অতি আশার এবং আরাধনার সন্তান সেলিম, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন। কারণ ঈর্ষা। পাত্র আবুল ফজল। আকবরের প্রিয় এবং বিশ্বস্ত পাত্র আবুল ফজলই বলতে গেলে আকবরের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। সেলিম ভাবলেন, আবুল ফজলের প্রতি আকবরের এই প্রীতি হয়তো তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হবে।

তাঁর বিদ্রোহে ইন্ধন যোগালেন আমার পিতা বীর সিংহ। এই অনিশ্চয়তা এবং সংশয়ের মধ্যে এই ধরনের দুঃসাহসী যুবক পেয়ে সেলিমও আশার আলো দেখলেন। দেখতে দেখতে বীর সিংহ সেলিমের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠলেন।

সেলিম পিতার আজ্ঞা অমান্য করা অনেকদিনই শুরু করেছিলেন—ক্রমশ নিজেকে এলাহাবাদের রাজা বলে ঘোষণা করলেন…নিজের নামে মুদ্রা বার করলেন। আকবর দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা আবুল ফজল তখন দাক্ষিণাত্যে। কোন কিনারা না করতে পেরে, ছেলের ব্যাপারে কি করা কর্তব্য, তা জানতে চাইলেন আবুল ফজলের কাছে।

আবুল ফজল জানতেন, সেলিমের জন্মের জন্য আকবর কত পূজা দিয়েছেন…কত সন্তের আশিস নিয়েছেন…পদব্রজে আজমের গেছেন সেলিম চিস্তির দোয়া পাবার জন্যে। সেই সেলিম বিদ্রোহী! তাঁর অন্নদাতা, বন্ধু আকবর যে কতটা ভেঙে পড়েছেন, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি তাঁর।

এত কথা লেখার হয়তো কোন দরকার ছিল না। আত্মজীবনী লিখে রেখে যেতে চাই আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য। তারা যেন আমার এবং আমার বাবার জীবনী পড়ে একটু সাবধান হয়, যেন তারাও সীমাহীন উচ্চাশার পিছনে উদ্দাম হয়ে না ছোটে, তাতে না আছে শান্তি না আছে মুক্তি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আবুল ফজল লিখলেন, 'সম্রাট চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি যাচ্ছি। এলাহাবাদের রাজাকে বেঁধে আপনার সামনে হাজির করব, কিচ্ছু ভাববেন না।'

সেলিমের গুপ্তচরের অভাব ছিল না। এ খবর পৌঁছতে তাই দেরি হল না তাঁর কাছে। তিনিও সরাসরি তাঁর প্রীতিভাজন বীর সিংহকে চিঠি দিয়ে জানালেন, 'আমি জানি, আবুল ফজল আমাকে সহ্য করতে পারে না। সে জনান্তিকে এবং প্রকাশ্যে আমার নামে কুৎসা রটনা

করছে। জানি, এ সাহস কোথা থেকে একজন বৃত্তিভোগী পায়। সে সম্রাটের স্নেহধন্য, তাই তার ক্ষমতা সীমাহীন হয়েছে।

খবর পেয়েছি, সে সম্রাটের কাছে যাচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতে। তার বুদ্ধির প্রতি ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে; আর আমার বিশ্বাস, বাবা তাকে কাছে পেলে যে বুদ্ধির খেলায় নামবেন, তাতে পেরে ওঠা আমার সাধ্যের অতীত, কাজেই বিষবৃক্ষের শিকড়শুদ্ধই তুলে ফেলা উচিত।

আবুল ফজল দাক্ষিণাত্য থেকে আগ্রা যাবার পথে নিশ্চয় বুন্দেলখণ্ডের ওপর দিয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পেরেছ, আমি কি ইঙ্গিত করছি? তুমি সসৈন্যে, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো বাবার বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর। তারপর···চিন্তা নেই, তুমি বিশ্বস্তভাবে কাজ করলে, মূল্য অবশ্যই পাবে, সেলিম অকৃতজ্ঞ নয়।'

আমি জানি না, আমার বা বিক্রমজিতের ভাগ্যে কি আছে। তবে, মনে হয়, আবুল ফজলের মত আমাদের ভাগ্যও আমাদের মৃত্যুর দিকেই তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। জীবন যত হাতে গোণা দিনের মধ্যে চলে আসে, ততই ইচ্ছে করে, আমি যা জানি, দেখেছি, আমার প্রিয়জনকে তা বলে যাই, জানিয়ে যাই। আজ আমার কাছে বিক্রমজিৎ ছাড়া কেউ নেই, তাই আমি লিখেই সব জানিয়ে যাচ্ছি।

আকবর, আবুল ফজলের অন্নদাতা প্রভু, তিনি বিপদাপন্ন। এই চিন্তা বিশ্বস্ত বন্ধুকে পাগল করে তুলল। সময় নষ্ট না করে আগ্রার উদ্দেশে রওনা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর অনুচরেরা সাবধান করলেন, এভাবে অল্প কয়েকজন দেহরক্ষীকে নিয়ে অত দূরের পথে যেতে। কিন্তু আবুল ফজলের নষ্ট করার মত সময় কোথায়?

১৯শে আগস্ট, ১৬০২ সাল। সকাল সকালই রওনা হলেন আবুল ফজল। আগ্রা যত নিকটবর্তী হয়, তাঁর মন তত চঞ্চল হয়। বুন্দেলখণ্ড দিয়ে চলেছেন সম্রাটের বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি জানলেন না, ভবিষ্যৎ সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল বীর সিংহের পাঁচশো শিক্ষিত অশ্বারোহী। বানের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেলেন আবুল ফজল আর তাঁর অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী।

আমার বাবা আবুল ফজলের ছিন্নমুণ্ড ভেট পাঠালেন সেলিমকে। দেহহীন নরমুণ্ড পেয়ে পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠেছিলেন ভবিষ্যৎ সম্রাট। কিন্তু আকবর? তিনি মাতৃহারা শিশুর মত কেঁদেছিলেন আবুল ফজলকে হারিয়ে। সম্পূর্ণ তিনদিন তিনি ওঠেন নি, জলস্পর্শও করেন নি।

এরপর তিনি ক্ষতির মাশুল হিসাবে চাইলেন বীর সিংহের শির। মূল্য ঘোষণা করা হল তাঁর মুণ্ডের।

বিভীষিকার মত আকবরের সৈন্য তাঁকে তাড়া করে ফিরতে লাগল।

ঝাঁসির কাছে একটি দুর্গে আশ্রয় নিলেন পরিশ্রান্ত বীর সিংহ। কয়েক দিনের বিশ্রাম চাইছিলেন। কিন্তু আকবরের সৈন্য আক্রমণ করল দুর্গ। রণক্লান্ত সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না, তাই ছদ্মবেশে পালালেন বীর সিংহ। তিন বছর চলল তাঁর আলো-আঁধারি জীবন।

এরপর সেলিম এলেন সিংহাসনে। বীর সিংহ পেলেন তিন হাজারী মনসব। এরপর, সেলিম তখন জাহাঙ্গীর—ওর্ছার সিংহাসনে রাজা রামচন্দ্রকে সরিয়ে বীর সিংহকে বসালেন। শুধু তাই নয়, বীর সিংহ তখন যে ক্ষমতা ভোগ করতেন, তেমন ক্ষমতা বড় বড় রাজারাও ভোগ করতেন কিনা সন্দেহ।

বেশ কিছুদিন রাজ্যসুখ ভোগ করলেন বীর সিংহ। মোঘল সাম্রাজ্যে আবার বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিল। বাবা সেই সুযোগে নিজের রাজ্যের সীমা বেশ বাড়িয়ে নিলেন। হিন্দু আর মোঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করলেন। মোতিমহল, বীর তালাও—সবই বাবার কীর্তি। বীর সিংহ শুধু দেশে নয়, মথুরায়ও মন্দির করেছিলেন।

সুখ স্থায়ী হয় না। তাই বাবার জীবনে আবার অশান্তি এল।

বড় ভাই রাজা রামচন্দ্রের ছেলে বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। বাবা জয়ী হলেন। বশ্যতা স্বীকার করলেও মনেপ্রাণে তারা বিদ্বেষ পোষণ করত। তার প্রমাণ পরেই পাওয়া গেল।

বীর সিংহের মৃত্যুর পর আমি এলাম সিংহাসনে। তখন শাহজাহান দিল্লীর তক্তে বসেছেন। চার হাজারি মনসব পাবার জন্যে প্রচুর উপ-ঢৌকন নিয়ে হাজির হলাম মোঘল দরবারে। মনে হল, হাওয়া বিপরীতগামী। আমি বুঝলাম, পলায়নই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করার আগেই মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে হল। আত্মীয়রা শত্রুতা করল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল দাক্ষিণাত্যে। মোঘলের ক্রীতদাস হয়ে থাকার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু কি করব? কিছুদিন হাসিমুখে এই কষ্ট সহ্য করেছিলাম।

যখন আমি দাক্ষিণাত্যে ছিলাম তখন ওর্ছার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম আমার ভাই হরদৌলের উপর। সত্যি কথা ব'লতে কি হরদৌল আমার থেকে ভালভাবে দেশ শাসন করছিল, সব থেকে বড় কথা দেশের লোক তাকে ভালবাসতো। দূরে—দক্ষিণ ভারতে বসে এ কথা জানতে পেরে আমি বড় শান্তিতে বা স্বস্তিতে ছিলাম।

কিন্তু আমার জীবনে বোধহয় ভগবান শান্তি লেখেননি তাই দেবতার মত ভাই-এর সম্বন্ধে আমার মনে বিষ জন্মাল। অবশ্য আমার মন বিষিয়ে দেবার পিছনে আত্মারামের হাত ছিল। তখন যে কথা বুঝতে পারিনি আজ তা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আমি যখন মোঘল দরবারে যাই তখন আমার ভাই হরদেব সিং, লোকে যাকে বলে হর-দৌল, তার উপর শুধু সিংহাসন নয় সমস্ত প্রজাদের ভালমন্দের ভার দিয়ে আসি।

সে বলেছিল 'ভাইসাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যান, আমি তো আছি।'

তবু সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল—'কিন্তু দেশে এত ঝগড়া, অশান্তি তোমার মত কম বয়সে কি সব দেখা সম্ভব হবে?'

হরদৌল হেসে বলেছিল—'দাদা, আমি এখন আর ছোট নেই, ঠিক সব দেখতে পারব। তারপর রইলেন সীতার মত পবিত্র আমার বৌদি চম্পাবতী—তাঁর হুকুম অনুসারে চালাব আপনার রাজ্য, আপনি নির্দ্বিধায় চলে যান দিল্লীতে, হয়ে আসুন চার হাজারি মনসবদার।

উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলাম দিল্লীতে সঙ্গে ছিল বন্ধু বেশী শত্রু আত্মারাম আর তারই সহায়ক ভগবন্তরায়। লজ্জার কথা ভগবন্তরায়, হরদৌলের মায়ের পেটের ভাই, আমার থেকেও কাছের সম্পর্ক। হলে কি হবে, লোভ! সে যে বড় বিশ্রী অসুখ, কিছুতেই সারতে চায় না, দিনে দিনে বাড়ে।

অঘটন ঘটার পর যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল তখন ভেবেছি, আমার বিমাতার গুমান কুমারীর ছেলেরা—ভগবন্তরায়, চন্দ্রভান বা কিসুন সিং কেন হরদৌলের বিরোধিতা করত? অনেক পরে মনে হয়েছে যে এর কারণ হরদৌলকে দেশের লোকে ভীষণ ভাবে ভালবাসতো। আমি রাজা হলেও মুঘল সম্রাটের বিষ নজরে থাকার ফলে আমার দিন খুবই সীমিত ছিল। ওরা জানত যখনই ওর্চ্ছার লোকেরা আমার বন্দিত্ব বা মৃত্যুর খবর পাবে তখনই হরদৌলকে সিংহাসনে বসাবে। হরদৌল যে রকম সৎ প্রকৃতির, তাতে সে রাজা হলে ভগবন্ত, কিসুন বা চন্দ্রের অসাধুতা বরদাস্ত ক'রবে না। সেইজন্যে আগেভাগে তাকে সরাতে চাইল। সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে সে ব্যবস্থা করে তারা নিজেরা রইল পর্দার আড়ালে আর আমার প্রিয় আত্মারামকে দিয়ে আমার কান ভারি করাতে লাগল।

এখন তো আমার অফুরন্ত অবসর। একমাত্র পালান এবং লুকান ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তাই যা মনে আসে বা ব'লতে পারি আমার চিন্তার বা বুদ্ধির ফসল লিখে রেখে যাচ্ছি। যদি কখনও আমার বংশধরের হাতে পড়ে বা অন্য কোন সৎ মানুষের হাতে পড়ে এবং যদি

ধৈর্য ধরে লেখা পড়ে তবে মনে হয় সে অনেক ভুলের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

আমি দক্ষিণ ভারতে থাকলেও মনটা পড়ে থাকত সেই বুন্দেলখণ্ডে, যেখানে আমার স্ত্রী চম্পাবতী, সন্তানরা বা প্রজারা রয়েছে। মাঝে মাঝে হরদৌলের চিঠি আসে লোক মারফত, লেখে—ভাইসাহেব, কোন চিন্তা নেই, আপনি সময় বুঝে চলে আসবেন, শুধু ওর্ছা নয়, সম্পূর্ণ বুন্দেলখণ্ড রয়েছে আপনার পিছনে, আর আছে আপনার সেবক, হরদৌল।

কখনও বা চিঠি আসে—রাজা সাহেব। আপনার সেবক হর-দৌলের সহস্র প্রণাম। মোঘল সৈন্যরা বড় বাড়াবাড়ি ক'রছে, এদের কাছে যত নিচু হওয়া যায়, ততই মাথায় ওঠে। এক এক সময় ইচ্ছা করে এদের সম্পূর্ণ নিকেশ ক'রে দিতে কিন্তু আপনার জন্যে পারি না। আপনি যে ওদেরই ছাউনিতে রয়েছেন।

আমি হরদৌলের মনোবলে, দেশপ্রেমে এবং সততায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে আত্মারামকে হরদৌলের কথা ব'লতাম। মানে প্রশংসাই ক'রতাম। প্রথম আত্মারামও আমার কথায় সায় দিত। পরে ক্রমশঃ সে অন্য সুর ধ'রল। একদিন এসে ব'লল—রাজাজী, জানি একটা কথা জেনে আপনার বড় দুঃখ হবে যে হরদৌল ওর্ছায় নিজের প্রভাব জমিয়ে তুলছে।

আমি অবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা উড়িয়ে দিতে গেলাম—না, না, তা হ'তেই পারে না। হরদৌল তেমন ছেলেই নয়।

ভগবন্তরায়, তখন অতি বিনীত ভাবে ব'ললে—ভাই সাহেব, আপনি হরদৌলকে বড় ভালবাসেন তাই আমরা চুপ ক'রে থাকি। আর তাছাড়া···

—আর তাছাড়া কি? বল, চুপ করে গেলে কেন?

—হরদৌলকে মদত দিচ্ছেন রানী চম্পাবতী।

—সে কি? তা কখনও হ'তেই পারে না।

ভগবন্ত করুণ মুখ ক'রে ব'লল—আপনি ওর্ছায় গেলেই সব জানতে পারবেন।

—কিন্তু রানী এমন কাজ ক'রবেই বা কেন ?

—ক্ষমতার লোভে। হরদৌল নিশ্চয় লোভ দেখিয়েছে তোমাকে রানী ক'রব।

হরদৌল আর রানী চম্পাবতীর উপর অবিশ্বাস তখন থেকে জমা হ'তে থাকে। এরপর হরদৌলের লেখা একটি চিঠি আর চন্দ্রভানের কথায় এই অবিশ্বাস ক্রোধে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল।

হরদৌলের চিঠি পেলাম—ভাই সাহেব, পারলাম না রাগ সংযত ক'রতে। মোঘল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হ'য়ে গেল, তবে আপনার আশীর্বাদে জয়ী হয়েছি। ঘটনাটা এবার বলছি। আপনার মোতিমহলের পিছনে যে ফুলবাগানটা আছে তার দেখা-শোনার ভার ছিল যার ওপর, সে একদিন এসে আমাকে জানাল যে, মোঘলদের বুন্দেলখণ্ড প্রতিনিধি হিদায়ত খাঁ নাকি প্রায়ই ঐ ফুলবাগানে আসে এবং মেয়েদের বিরক্ত করে। আপনি জানেন ওটা অন্দরমহলের বাগান, ওখানে কোন পুরুষ যেতে পারে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাল কথায় বারণ ক'রলাম, আমার কথা শুনলই না। পরের দিন যখন তার ছেলে ঐ বাগানে ঢুকে মেয়েদের বিরক্ত ক'রতে গেল তখনই আমি তাকে মেরে ফেলি। বুঝতেই পারছেন হিদায়ত এই ব্যাপারে কি রকম রেগে গেল। সে সব কথা বাদশাহকে জানিয়ে চর পাঠালে বাদশা তখনই অনওয়ার খাঁ-এর নেতৃত্বে বিশাল একদল সৈন্য পাঠান। তারা ওর্ছা আক্রমণ ক'রল।

ভাই সাহেব, আপনি শুনলে খুশী হবেন মোঘলদের এমন ভাবে পরাজিত ক'রেছি যে তারা আর কোনদিন এদিকে নজর দিতে সাহস ক'রবে না।

আমি হরদৌলের চিঠি পড়ে মোটেই খুশী হ'লাম না বরং বিরক্তই হ'য়েছিলাম। ঠিক তখনই চন্দ্রভান আমাকে কুচক্রীর মত বললে, রাজাজী ফুলবাগান বা হিদায়েতের কথা সবই মিথ্যা, আসলে হরদৌল

বাদশাহের কাছে আপনার পরিচয় খারাপ করার জন্যেই এসব ক'রেছে।

ভগবানের এমনই লীলা যখন চন্দ্রভান আমাকে এইসব কথা ব'লছে তখনই দিল্লী থেকে শাহজাহানের শিলমোহর করা চিঠি এলো, যার ভাবার্থ এই রকম—

জুঝার সিং, তোমার শক্তি বড় বেশী হয়েছে ব'লে ম'নে হয়। তোমাকে চারহাজারি মনসব দিইনি ব'লে—তুমি মোঘল সৈন্যের বিরোধিতা ক'রছ। আশা করি এর ফল তোমার জানা আছে। ওর্ছার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানকে কব্জা করা মোঘল সেনাদের পক্ষে কিছুই নয়, নেহাৎ দয়া পরবশ হ'য়ে তোমাকে ওর্ছার রাজা রাখা হ'য়েছে। যদি নিজের গদি বাঁচাতে চাও তবে যেমন ক'রে পার তোমার প্রিয় হরদৌলকে ওর্ছা থেকে সরিয়ে দাও। না হ'লে তোমাকেই সিংহাসন থেকে সরতে হবে।

চিঠিটি বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ ক'রল। এখনই হরদৌলকে সরাতে হবে। চন্দ্রভানকে ব'ললাম—তুমি এখনই গিয়ে হরদৌলকে ওর্ছা থেকে সরিয়ে দাও।

সে শান্ত কণ্ঠে ব'লল—রাজাজী, ক্রোধের বশে কোন কাজ ক'রলে ফল ভাল হয় না। এখনই নয়, আপনি দেশে ফিরে গিয়ে বুদ্ধি করে ওকে সরাবেন।

তারপর মাথা চুলকে, করুণভাবে ব'লল—আমার মনে হয় এটা রানীমাকে দিয়ে করালেই সব থেকে ভাল।

কথাটা মাথার মধ্যে ব'সে গেল।

এদিকে আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম দেশে ফেরার, সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধনরত্নও যোগাড় করার ইচ্ছা। দাক্ষিণাত্যের চারিধারে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ এক সময় সুযোগ এলো, গোস্ত রাজ্যের রাজা প্রেম-নারায়ণকে হত্যা করে বিপুল ধনরাশী নিয়ে ওর্ছায় এলাম।

আমার আসার সংবাদ পেয়ে হরদৌল ছুটে এলো। ব'লল—ভাই

সাহেব, আজ আমি নিশ্চিন্ত, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে নিন। কি ভাবে যে বুকে ক'রে আগলে রেখেছি সে কথা জানেন ভগবান আর জানেন ভাবী চম্পাবতী।

চম্পাবতী নামটা কানে আসতেই আমার ঈর্ষা চিড়চিড় ক'রে জ্বলে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ ক'রলাম না।

হরদৌলকে বিশ্বাস ক'রতাম না তাই ঐ বিপুল সম্পত্তির কথা তাকে কিছু বলিনি এমন কি রানী চম্পাবতীকেও না। তবে জানতাম এই অগাধ সম্পত্তি আমি ভোগ ক'রতে পারব না কারণ মোঘল সৈন্য আমার পিছনে লেগে আছে। সেইজন্যে মোতিমহলের বিশেষ জায়গায় ধন-রত্নের অধিকাংশ গোপন ক'রে রাখলাম। আমি বা আমার ছেলে যদি ভোগ করতে নাও পারি, আমার বংশের যদি কোথাও কেউ থাকে তবে সে যেন ভোগ করে।

এমন জায়গায় লুকিয়েছিলাম যা বিনা নক্‌শায় আমি ছাড়া ভগবানও খুঁজে পাবে না। পথ ক'রলাম দুটো, শোবার ঘর থেকে একটা, আর বীর তালাওয়ের পাশ দিয়ে একটা।

হীরা, জহরৎ, চুনী, পান্নার কিছু অংশ দুটো থলেতে ভরে রেখেছিলাম, যদি পালাই সঙ্গে নিয়ে যাব, এই বাসনায়।

লুটের সম্পত্তির মোটামুটি বিলি ব্যবস্থা ক'রে আমি এবার হর-দৌলকে মারার কথা চিন্তা ক'রতে লাগলাম।

চম্পাবতী একদিন আমাকে ব'লল—তুমি এবার ফিরে এসে সব সময় কি ভাব বুঝতে পারি না। হরদৌলের সঙ্গেও তেমন কথা বলঁ না, তাই ও দুঃখ ক'রছিল।

কথাটা শুনে আমার মাথায় যেন রক্ত চ'ড়ে গেল। আত্মারাম, চন্দ্রভানের কথা মনে পড়ল। আমি কঠোরভাবে বললাম—তার কারণ তুমি এবং তোমার আদরের দেওর হরদৌল।

চম্পা যেন আকাশ থেকে প'ড়ল—এ তুমি কি ব'লছ, কিছুই বুঝতে পারছি না

আমার মনে হ'লো চম্পা অভিনয় ক'রছে। ব'ললাম—তুমি তো বুঝতে পারবে না, সম্ভবতঃ বললেও অস্বীকার ক'রবে।

—বল শুনি।

—আমার কাছে খবর আছে যে তুমি আর হরদৌল মিলে আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে চাও।

চম্পার মুখ ক্রোধে লাল হ'য়ে উঠলেও সংযত ভাবে প্রশ্ন ক'রল—কারণ ?

—কারণ, পরিষ্কার। তুমি সিংহাসনে ব'সবে আর হরদৌল হবে তোমার মন্ত্রী।

কথাটা চম্পা সম্পূর্ণ শুনতেই চাইল না। ব'লল—এ তুমি কি ব'লছ ? তুমি পাগল হ'য়ে গেছ। হরদৌল আমাকে মায়ের মত আর তোমাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করে। ছি, ছি, ছি।

আমার কিন্তু লজ্জা হয়নি। আজ অকপটে স্বীকার করছি। হরদৌল নেই, সে আজ দেবতার আসনে ওছাঁয় বসে আছে, রানী চম্পাবতীও নেই, জহরব্রত ক'রে স্বর্গে গেছে। শুধু আমি কুকুরের মত আজ এ-দরজা কাল ও-দরজায় আশ্রয় নিয়ে বেড়াচ্ছি।

গর্বিতভাবে আমি চম্পাকে ব'ললাম যদি সত্যই তোমার মনে কোন পাপ না থাকে তবে হরদৌলকে বিষমাখা অন্ন দিয়ে মেরে ফেল না।

চম্পা শিউরে উঠে ব'ললে—সেকি ? একজন সৎ, নির্দোষ মানুষকে আমি হত্যা করব কেন ?

বেঁকা হাসি হেসে ব'ললাম —আমি জানি তুমি তা পারবে না। কিন্তু হরদৌল যখন আমার অন্নে বিষ দিতে ব'লবে তুমি তখন সহজভাবেই দেবে।

—সে কখনও এমন ঘৃণিত কাজ ক'রবে না।

—ঠিক আছে, তুমি যে স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ সৎ সেটা প্রমাণ ক'রে দাও।

—বেশ তাই হবে।

আমিই হরদৌলকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সে আনন্দের সঙ্গে এলো, খেতে বসল। রানী চম্পা খাবার দিল। দেবরের কাছে খাবার দেবার সময় রানী কেঁদে ফেলল।

হরদৌল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে— কি হলো? ভাভী তুমি কাঁদছ কেন?

চম্পা আর স্থির থাকতে পারেনি। বলেছিল—তোমার দাদা, আমাকে এবং তোমাকে অবিশ্বাস করছে। তাঁর ধারণা আমরা দুজনে নাকি তাঁকে গদিচ্যুত করব। সেটা যে সত্য নয় তা প্রমাণ করার জন্যে তোমার খাবারে বিষ দিয়েছি।

হরদৌল হেসে বলল—ভাভী কাঁদছ কেন? তুমি তো ঠিকই করেছ, অবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার থেকে মরাই ভাল।

এই বলে হাসি মুখে বিষ মেশান খাবার খেয়ে নিল।

হরদৌল তো মরে জিতে গেল। আমি ঘরে এবং বাইরে লাঞ্ছিত হতে লাগলাম। এর মধ্যেই হরদৌলের নিজস্ব সাতশ' সঙ্গী এক সঙ্গে আত্মহত্যা করল। প্রজারা উন্মত্ত হয়ে উঠল—তারা রাজবাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ জানায় প্রতিদিন।

শুধু বিক্ষোভই নয় শুরু হয় মোঘল আক্রমণ। আমি প্রায় দিশাহারা। যখন মোঘল আক্রমণ খুব জোরের সঙ্গে চলছে, তখন হঠাৎ তারা রণে ভঙ্গ দিল। কারণ কি বুঝতে পারিনি। অবশ্য কয়েক দিনেই জানতে পারলাম কারণ—শোনা গেল হরদৌলের আত্মা মোঘল সেনাপতি হিদায়ত খাঁকে এমন বিরক্ত করছে যে সে ভয়ে যুদ্ধ ছেড়ে দিল্লীর পথে পা বাড়াতে বাধ্য হলো।

মোঘল রাজ শাহজাহান খবর পেয়ে হিদায়ত খাঁ-এর উপর রাগারাগি করলেন এবং অন্য সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ওর্ছায় সৈন্য পাঠাবেন বলে মনস্থ করলেন।

যে রাত্রে তিনি সৈন্য পাঠাবেন ঠিক করলেন সেদিন রাত্রেই হরদৌলের আত্মা তাঁকে খাট থেকে ফেলে দেয়।

এই সব ঘটনার খবর আমার প্রজাদের মনে হরদৌল সম্বন্ধে একটা ভক্তি ভাব জাগাতে লাগল। সেই সময় আবার আমার বোন কুঞ্জকুমারী একটি কাহিনী বলল, তার ফলে হরদৌলের মহত্ত্ব থেকে দেবত্ব প্রাপ্তি হলো।

দেশের লোকেরা চারিধারে হরদৌলের স্মৃতিতে বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিল। কুঞ্জকুমারী মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে মনস্থ করল আমাকে নিমন্ত্রণ করবে না। হরদৌলের স্মৃতিস্তম্ভে কুঞ্জকুমারী নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলো। আশ্চর্য, দির্দিষ্ট দিনে হরদৌল ঘোড়ার পিঠে এবং রথের উপর সোনা, হীরে, মুক্ত ইত্যাদি ভরে নিয়ে বোনের বাড়ি উপস্থিত হয়েছিল। এরপর থেকে যার বাড়িতে যা শুভ কাজ হতো সেখানেই হরদৌলের নিমন্ত্রণ হতো। লোকে প্রেতাত্মাকে ভয় করে আর ওছার্ির মানুষ হরদৌলের আত্মাকে পুজো করে।

তা করে করুক। এ সম্মান তারই পাওনা। আর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দুঃখ হয় বিক্রমজিতের জন্যে। বেচারা রাজপুত্র হয়ে জন্মেও শুধু দুঃখই ভোগ করে গেল। আমি অভাগা বাপ—না পারলাম তাকে সিংহাসনে বসাতে না পারলাম সুখী করতে। যাক সময় বড় কম, এবার দরকারি কথা লিখে নিই।

মায়া করে সব অর্থ রেখে আসতে পারিনি, কম ভাগ সঙ্গে এনেছি যার কিছুটা অংশ রাখলাম চৌরাগড়ে ঢুকতে প্রথম ডান দিকের কুয়োর মধ্যে, বাকি অর্ধেকটা কেশব দেবের মন্দিরের অগ্নিকোণে পিতলের ঘড়ায় করে। ভাবলাম, জঙ্গলের মধ্যে কে বা খোঁজ পাবে।

এখানেই শেষ করছি। শুধু নক্শা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা—শোবার ঘরে একটি কুলুঙ্গিতে দেবীর মূর্তি আছে। সেটি সরালে একটি রূপোর পাত দেখা যাবে, সেটি তুলে ফেললে একটি ছোট্ট কড়া হাতে ঠেকবে, সেটি জোরে টানলে কুলুঙ্গির নিচে থামটা ঘুরে যাবে আর একটা দরজা

বেরিয়ে আসবে। তার গায়ে তালা লাগানো আছে। তার চাবি দুর্গার হাতে ধরা খড়্গের মধ্যে পাওয়া যাবে। দরজা খুললে একটা সরু সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সেটা দিয়ে নামলেই গুপ্তধনের ঘর। নক্শার মধ্যে লেখা আছে কোথায় কি আছে।

আর একটি পথ, বীর-তালাও-এর পশ্চিম পাড়ে অশ্বত্থ গাছের পাশে বেদীর নিচে দিয়ে। বেদী সরালে একটা পাথর। পাথর সরালে দরজা, দরজা খুলে সুড়ঙ্গ পথে গেলেই ওই ঘরে পৌঁছন যাবে। চাবি রয়েছে সাদা বেদীর পাশে লাল পাথরের নিচে মাটির মধ্যে কৌটোর ভেতরে।

···আর লেখার কিছু নেই। দেরীও হচ্ছে, উদয়ভানু দাঁড়িয়ে আছে তার দেরী করা ঠিক হবে না, এখানেই শেষ করছি। সকলের জন্যে আশীর্বাদ রেখে গেলাম।

জানি না, আমার বংশের কেউ বেঁচে থাকবে কিনা। পালাবার আগে মেয়েদের সব জহর ব্রত করিয়েই এসেছিলাম, পাছে মোঘলের হাতে পড়ে।···ইতি জুঝার সিং। পুঃ—এই সঙ্গে আমাদের বংশের শীলমোহর যুক্ত আংটি দিলাম।

চিঠি পড়ার পর বীরেন্দ্র সিং বেশ কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে রইলেন। আদিত্য সবটাই লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ আঘাত দিয়ে আবেশটা কাটাতে চাইল না। কিছুক্ষণ পরে বীরেন্দ্র মুখ তুলে দেখলেন, আদিত্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

উনি ধীরে ধীরে বললেন, এবার তুমি কি জান, তা বল—তবে সবটা পরিষ্কার হবে।

সেও তো ছোটখাটো ইতিহাস, আপনি না বিরক্ত হন।

না, না, বিরক্ত হব কেন ? তুমি শুরু কর।

আমি বোটানির ছাত্র ছিলাম। শুধু তাই নয়, ভেষজ ওষুধের ওপর আমার খুব ঝোঁক। চিত্রকূটে হাঁপানির ওষুধের কথা শুনে এখানে আসি। সেই ওষুধে কি কি গাছের শিকড় লাগে, তাই খোঁজ করতে করতে হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাকে জটাধারী বাবা বলতাম।

তিনি একদিন বললেন, আদিত্য, আমার কেমন মনে হচ্ছে, আর বেশি দিন বাঁচব না। অথচ মরারও উপায় নেই, আমার কাছে এক-জনের গচ্ছিত সম্পত্তি আছে। একটিও বিশ্বাসযোগ্য লোক পাচ্ছি না, যাকে এটা দেব—যে এটা আসল লোকের কাছে পৌঁছে দেবে। গচ্ছিত রেখে সে যে কোথায় গেল ! মাঝে একটি ছেলে সন্ন্যাসী হবে বলে এল। বেশ কিছুদিন আমার কাছে রইল। একদিন শুধু তাকে এই সম্পত্তির সম্বন্ধে একটু বলেছিলাম। তারপর থেকেই সে যেন কেমন হয়ে গেল, সব সময় চেষ্টা করত ওই সম্পত্তি কোথায় আছে, সেকথা জানতে।

আমি সজাগ হলাম। পাছে সব নিয়ে যায়, তাই গুপ্তধনের দুটি নকশা দু' জায়গায় রাখলাম।

একদিন নদী থেকে স্নান করে ফিরে দেখি, সে উধাও আর একটা নকশাও নেই। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। তবে সান্ত্বনা এই যে, ওই নকশায় শুধু ছকই আছে, চাবি কোথায়, তা কিন্তু লেখা নেই। তাই ভাবছিলাম, এমন এবজন লোককে চাই, যে ও-যাবার আগে গুপ্তধন বার করে, যার সম্পত্তি তাকে দেয়। তোমাকে মনে হচ্ছে, বিশ্বাসী হবে—ভেবে ক'দিন দেখব।

জটাধারী বাবা গল্প করতে করতে বলেছিলেনঃ এই খাতাটা পাবার পর আমিও জপতপ ভুলে গেলাম—অবশ্য সম্পত্তির লোভে নয়, এই পুরোনো চিঠিটা উদ্ধার করতে। লেখক খুব সতর্কতার সঙ্গে বাক্সের মধ্যে করে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে নষ্ট না হয়। কিন্তু সব সময় তো ইচ্ছা মত কাজ হয় না—লেখক যাকে এটি দিয়েছেন, তিনি বিপদের সম্ভাবনা ভেবে এই বাক্সটা জলে ফেলে দিয়েছিলেন, কিংবা তিনি নিজেই জলে পড়ে গিয়েছিলেন।

…ভাগ্যের কি অমোঘ টান দেখ, সেই নথিপত্র আমার হাতে এল। পুরো দুটি বছর, বহু যত্নে এটি পাঠযোগ্য করেছি।

বীরেন্দ্র আদিত্যের কথা শুনলেন মন দিয়ে। কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর মুখটা তুলে বললেন, তাহলে তুমি বলছ, এই গুপ্তধনের আর একটা নক্‌শা অন্য একজন নিয়ে এসেছে?

হ্যাঁ, তাই তো সন্ন্যাসী আমাকে বলে গেছেন।

কিন্তু কেউ তো আমার কাছে আসেনি, এই ধরনের নক্‌শা নিয়ে।

যে ওই নক্‌শা নিয়ে এসেছে, সে তো আপনাকে দেবে বলে আনে নি! সে তো চায়, সবটাই আত্মসাৎ করতে।

তুমি চাও না কেন?

কথা শুনে আদিত্য হেসে উঠল। বলল, আমার অত লোভ নেই।

তাহলে তুমি সরাসরি পুলিশের কাছে গেলে না কেন?

এর দুটি কারণ। প্রথমত, যিনি আমাকে দিয়েছেন, তিনি চেয়েছিলেন যে, আসল লোক যাতে পায়, তা দেখতে। দ্বিতীয় কারণ

এই যে, নক্শাটার সত্যি কোন মূল্য আছে কিনা তা দেখা ; যা কোন একটি দরজা খুলে দেখলেই দেখা যাবে।

আমিই যে আসল লোক, তা জানলে কি করে ? জুঝার সিংহের বংশধর তো ওর্ছায় ছিল না ওই সময়।

আমি বেশ কিছুদিন আগে এখানে আসি, সব খবর সংগ্রহ করি। জুঝার সিংকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে রাজা রামচন্দ্রের নাতি দেবী সিংহ বুণ্ডেলাকে ওর্ছায় বসানো হয়। জুঝার তাঁর বংশের সব মেয়েদের জহরব্রত করান, পাছে মোঘলের হাতে অপমানিত হয় সেই ভয়ে। কিন্তু তাঁর মনে ছিল না, তাঁর এক পুত্রবধূ ঝাঁসিতে পিত্রালয়ে ছিলেন ; তাঁর কোলে তখন মাত্র কয়েক মাসের শিশুপুত্র।

এই ছেলে বড় হয়েছে···শক্তি সংগ্রহ করে ওর্ছায় দখল নিয়েছে। সেই থেকে দেবী সিংহদের ঈর্ষা আপনাদের প্রতি। ওই বংশের এখন যিনি—ছত্তর সিং, তিনিও সেই ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলছেন।

তুমি তো অনেক খবর সংগ্রহ করেছ ?

হ্যাঁ। এবার আপনার সাহায্য পেলেই সুবিধা হয়।

সাহায্য নিশ্চয় পাবে। কিন্তু প্রথমেই খটকা লাগছে, আমার শোবার ঘরে কোন দেবীমূর্তি নেই।

কিছু মনে করবেন না, তিনি যে ঘরে শুতেন সেই ঘরটাই কি আপনিও শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করছেন ?

তা ঠিক জানি না। সম্ভবত নয়। কারণ আগে হয়ত পিছনের মহলটা ব্যবহার হত, এখন তো সব তালা বন্ধই থাকে। বছরে দু-একদিন খোলা হয়, তখনই ঝাড়-পোঁছ হয়।

এই সব চাবি কার কাছে থাকে ?

আমার খাস চাকর চমনলালের কাছে থাকে।

আজ কি পাওয়া যাবে না ?

তা যাবে না কেন ? কিন্তু কারোর সন্দেহ হয়, এমন কিছু করতে

চাই না। বরং কাল তোমাকে বাড়ি দেখানোর নাম করে ওই সব ঘর খুললেই হবে।

আদিত্যের যদিও ইচ্ছা ছিল আজই দেখার, তবু নিজের ইচ্ছা সম্বরন করল ঃ ঠিক আছে, তবে কালই হবে।

আজ তবে তুমি শুয়ে পড়—অনেক রাত হয়েছে।

ঠিক আছে, শুয়েই পড়ি, বড় ক্লান্ত লাগছে। আচ্ছা, মাস দুয়ের মধ্যে কোন নতুন লোক আপনার এখানে কাজে এসেছে ?

না তো !…হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন এসেছে শুনেছি। একদিন দেখেওছি। সে আমাদের গরুদের খাবার দেয়। শুধু তাই নয়, কালা আর হাবা। …কেন ?

না। সেই লোকটি নক্‌শা নিয়ে গেল কোথায় ? আর একটা কথা, ওই বীর তালাওটা কোথায় ?

ওই তো, আমাদের বাড়ির লাগোয়া দক্ষিণ কোণে। আচ্ছা, শুভ-রাত্রি, তুমি ঘুমোও।

পাশের ঘরে চমনলাল বেশ সুন্দর বিছানা করে দিয়েছে। ছোট্ট নীল আলোটা জ্বলছে। আদিত্য জামা ছাড়ল। একটা সিগারেট ধরাল। বিছানায় না গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। পূর্ব দিকের জানলা দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতেই মনে হল, জানলার পাশ থেকে কে সরে গেল। চট করে আদিত্য উঠে জানলার কাছে গেল। কাউকে দেখতে পেল না।

মনটা কেমন ভার ভার হয়ে উঠল। আবার নিজেই মন থেকে বাজে চিন্তাগুলি তাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঘরটা খুব পুরোনো নয়, অন্তত শতবর্ষ পূর্তি হয় নি—দরজাগুলি দেখে তাই মনে হয়।

বেশ প্রশস্ত ঘর। সুন্দর খাট, বিছানা, একটা সোফা সেট। একটা লেখার টেবিল, সঙ্গে চেয়ার। দেওয়ালে আয়না লাগানো, তার নিচে মার্বেলের টেবিল। এই টেবিলটা দেখলে বোঝা যায়, বেশ

পুরোনো দিনের। প্রতিটা কাঠের আসবাবে বাটালির নিখুঁত কাজ, যতই হোক, রাজবাড়ি তো! বিছানায় হালকা সবুজ মখমলের বেড-কভার। সেই মুহূর্তে আদিত্যর কেমন নিজেকে রাজা রাজা মনে হল।

চোখের দৃষ্টি আবার জানলা গলে বেরিয়ে গেল। সেখানে অর্জুন গাছের ফাঁকে বেশ বড় চাঁদ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ও কি আদিত্যর সঙ্গে মজা করছে? কেমন যেন দুষ্টু হাসি ওর মুখে। আজ কি তিথি, কে জানে! এত রাতে চাঁদ যখন, নিশ্চয় কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া-চতুর্থী হবে।

জীবনে বোধ হয় দ্বিতীয়বার চাঁদকে এমন একান্তে ভাল করে দেখল। কলকাতায় বাড়ির মাথায় চাঁদ উঠতে দেখেছে অসংখ্যবার। কিন্তু সে যেন বহুদিন ক্ষয়রোগে ভোগা রক্তহীন রোগী আর এখানের চাঁদ যেন উন্নতশীর সতেজ বলিষ্ঠ এক শাসক তার অধীনস্থ তারাদের দিকে গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

ঘুম আসছিল। শুয়ে পড়ল সে।

7

সানাইয়ের আওয়াজ শুনে আদিত্যর ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে জাগার পর ধোঁয়াটে আবেশের মধ্যে আদিত্য ভাবতে চেষ্টা করল, বাড়িতে কার বিয়ে! চন্দনার? সে তো হয়ে গেছে। তবে···হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে যে এখন সত্যসন্ধানী! প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল। ভোরের বাতাস তার গায়ে যেন সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল।

উঠে পড়ল। লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল। লোক ওঠার আগেই পুকুর পাড়ে গুপ্তধনের পথটা খুঁজে বার করতে হবে। যদি দেখা যায় সেটায় কারোর ছোঁয়া পড়ে নি, তাহলে তো সব হয়েই গেল। গুপ্তধনেও তাহলে কারোর হাত না পড়ারই কথা।

দেউড়ির দরজা খোলা। দারোয়ান খাটিয়ায় ঘুমোচ্ছে। কেউ জানতেই পারল না, ও বেরিয়ে গেল। এদের সাহস আছে। এই রকম দরজা খুলে শুয়ে থাকে।

বীর তালাওয়ের কাকচক্ষু শান্ত জল দেখলে মনে হয় না, কত হিন্দু নারী নিজের লজ্জা রক্ষার জন্যে এর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই সব মেয়েদের স্মৃতিচিহ্ন কি জলে ডুব দিলে পাওয়া যাবে? জুঝার সিংহ তাঁর পরিবারের মেয়েদের অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে জহর-ব্রত করিয়েছিলেন। সে কোথায়, কে জানে। এত পুরোনো কথা কি কেউ বলতে পারবে?

ঘাটের ধার মার্বেল দিয়ে বাঁধান। যদিও অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। বীর সিংহ মোঘলদের স্নেহধন্য ছিলেন, তাই স্থাপত্যে মোঘল শিল্পের ছায়া।

পুকুরের পশ্চিম পাড় কোন দিকটা হবে। দিক নির্ণয় করার জন্য

চোখ তুলতেই দেখল, পূর্ব আকাশ সূর্যের আগমন পথে আবির ছড়াচ্ছে।

পশ্চিম পাড় দিয়ে এগিয়ে গেল। দূর থেকেই অশ্বত্থ গাছটা দেখা যাচ্ছে। সে যেন অতীত দিনের সাক্ষী। অশ্বত্থের পাশে নিম গাছ রয়েছে। পঞ্চবটী ছিল নাকি ? কিন্তু বটগাছ তো দেখা যাচ্ছে না। বটের তো মৃত্যু নেই।

অশ্বত্থ গাছের কাছে আসতেই বেদীটা দেখা গেল। আরও কাছে এসে ঝুঁকে দেখতেই ও চমকে উঠল। বেদীটা কেউ সরিয়েছিল, পাশের মাটি আলগা আলগা। আদিত্য দু-হাত দিয়ে পাথরটা সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু এত ভারি যে, সরাতে পারল না।

হঠাৎ ওর চোখটাকে মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলতেই, ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ কে ? কে আমার চোখ···

ও কথা শেষ করতে পারলে না—শক্ত হাতে কেউ তার মুখটা চেপে ধরে বিকৃত গলায় বলল, প্রাণের মায়া থাকে তো আজই এখান থেকে সরে যাবি। আর যাবার আগে তোর কাছে যে নক্শা আছে, দিয়ে যাবি। চিৎকার করলে বা এই বিষয় কাউকে কিছু বললে গলা টিপে দেব।

এবার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, নক্শা কোথায় ?

আমি দিয়ে দিয়েছি।

কথাটা শুনে একটা আর্তনাদের মত স্বর বেরিয়ে এল ঃ দিয়েছ ?

আদিত্য অনাবশ্যক উত্তর না দিয়ে বলল, আমার চোখ ছাড়।

না, ছাড়ব না। তোমাকে সিং-দরজার রাস্তায় ছেড়ে দিচ্ছি, সোজা গেলেই পৌঁছে যাবে।

আদিত্য চোখের কাপড় খুলতে যেতেই, লোহার বেড়ির মত শক্ত হাত তার হাত দুটোকে বেঁকিয়ে শরীরের পিছন দিক দিয়ে নিয়ে এল, তারপর বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল।



কতকটা পথ হাঁটিয়ে এনে সেই লোকটি বলল, যা, সোজা চলে যা —একেবারে দেশে। নাহলে ডিটেকটিভগিরি ঘুচিয়ে দেব।

আদিত্য কতক্ষণ ওই অবস্থায় হাঁটছিল, জানে না। মনে হচ্ছিল, পথের শেষ নেই। কি ক্লান্তিকর। কোথা থেকে এক জালে জড়িয়ে পড়ল। প্রেমের ফাঁদ ভুবনে পাতা আছে কিনা আদিত্য জানে না, তবে বিপদের যে ফাঁদ পাতা থাকে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে ধরা পড়েছে সেই ফাঁদে। যাই হোক, সে শেষ না দেখে যাবে না।

একটা চিৎকার কানে এল ঃ আরে রামরে, সাহেবকা কা হোই গাওয়া ? কৌন্ সত্যানাশ কিয়া রে ?

গলাটা চেনা চেনা, বোধ হয় চমনলাল।

দ্রুত হাতের বাঁধন, চোখের বাঁধন খুলে জিজ্ঞেস করল, কে একাজ করল ?

আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলল। শুধু বলল না যে, ও গুপ্তধনের পথ খুঁজছিল।

চমনলাল বলল, আমাকে ডাকলেই তো পারতেন। বিদেশে এসে কি জীবন দেবেন ? এখানে চারিধারে শত্রু। চা না খেয়ে যে আপনি এরকম বেরিয়ে যাবেন, আমি ভাবিই নি।

ওর গলার স্বরে কেমন একটা কৈফিয়তের ভাব।

আদিত্য এসে নিজের ঘরে বসল। একটু পরেই ট্রেতে করে চা নিয়ে এল চমনলাল। ট্রে, কেটলি, দুধ, চিনির পাত্র ইত্যাদি সবই রূপার। সচ্ছল ঘরের ছেলে আদিত্য, রূপার বাসন দেখেছে ঠিকই—নতুন জামাইয়ের ভাত খাবার জন্যে বা নতুন বৌকে ভাত দেবার জন্যে, বাচ্চাদের অন্নপ্রাশনে রূপার থালার ব্যবহার দেখেছে। কিন্তু অনাহূত অতিথির আপ্যায়নে রূপার চা-দানি ? না, সে দেখেনি—এমন কি কল্পনাও করে নি।

যা হোক, এক দিনকা সুলতান ! একটু আগে ফিরে পাওয়া প্রাণটাকে কিছু আনন্দ দেওয়া আর কি ?

উপভোগ করে চা পান শেষ করার আগেই চিন্তিত মুখে বীরেন্দ্র সিং ঢুকলেন।

বেশ উদ্বেগজড়িত গলায় বললেন, কি, কোথাও লাগে নি তো?

না, না, কোন চিন্তা করবেন না।

দোষ আমারই। বলে দেওয়া উচিত ছিল, এখানে চারিধারে আমার শত্রু। তবে ভাবিনি, তোমাকে কিছু করবে বলে।

আদিত্য বেশ উৎফুল্ল ভাবে হেসে বলল, ভালই হল, বোঝা গেল গুপ্তধন এখনও আছে। তবে, গুপ্তধনের খবর আগেই পৌঁছে গেছে, সম্ভবত আপনার বিরোধী মহলে।

কেন, কেন, কি করে বুঝলে?

বীর তালাওয়ের পাশের গুপ্তধনের পথ দেখলাম কেউ আবিষ্কার করেছে। এবং কোন একজন লোক নয়, কয়েকজন এতে যুক্ত আছে।

কি দেখে তোমার মনে হল?

পাথরের বেদীটা আমি সরাতে গেলাম, কিন্তু সেটা নাড়াতেই পারলাম না।

আমাদের দেরী করার কোন মানে হয় না। একটু পরেই···

কথা শেষ হবার আগেই প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন, রাজাজী, কোয়ারি থেকে ঠিকেদার সাহেব এসেছেন।

বসতে বলুন, আমি যাচ্ছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আদিত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই সাহেবই কাল রাত্রে এসেছেন না! আপনার পরিচিত নাকি?

না, পরিচিত নয়। তবে, আমারই এক আত্মীয় ওকে পাঠিয়েছে। ও এসেছে, আগের দিনের বাড়িঘর দেখতে।

তা বেশ, তা বেশ।

মুখে বেশ বললেও, তিনি যে এই বাড়ি দেখা ব্যাপারটা বেশ বলে মনে প্রাণে নিতে পারেন নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বীরেন্দ্র মনে মনে অপ্রসন্ন হলেও মুখে প্রকাশ না করে, হরবংশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ততক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি।

হরবংশ অতি বিনয়ের সঙ্গে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করার সময় তাঁর হাতের বিশাল আংটিটার প্রতি চোখ পড়তেই আদিত্য কেমন একটু কেঁপে উঠল। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যই।

নায়েব হরবংশ চলে যেতেই আদিত্য বলল, আপনি বাইরের কাজটা সেরে আসুন। কেননা, আমাদের তো বেশ সময় লাগবে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আমি কাজ সেরেই আসি।

আদিত্য বসে বসে ভাবছিল। জাল বেশ ছড়িয়ে পড়েছে, একে গুটিয়ে আনা এক মস্ত সমস্যা। ও কি করতে বেরোল, আর কি হয়ে গেল। এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে হয়। ভয় পেয়ে পালাবে ? না, না, তা কখনও হবে না। শেষ দেখে যাবে, অবশ্য যদি বেঁচে থাকে শেষ পর্যন্ত ··· কথাটা ভাবা শেষ হবার আগেই দূর থেকে দুজনে কথা বলতে বলতে আসছে, বোঝা গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বীরেন্দ্র সিং ঢুকলেন—সঙ্গে একটি যুবক। ছেলেটির চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা মানুষকে আকৃষ্ট করে। নিখুঁত একটি রাজপুরুষের মূর্তি। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সজীব, উজ্জ্বল দুটি চোখ।

বীরেন্দ্র বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এ আমার সম্বন্ধী, জয়পাল সিং। লেখাপড়ায় খুব ভাল ছেলে। তবে, মাঝে মাঝেই দার্শনিক হয়ে পড়ে।

কথাটা শুনে জয়পাল ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলল, আপনি কি যে বলেন না, উনি কত বিদ্বান লোক, আমার কথা কি যে বলেন···

বা, ভালকে তো ভাল বলাই উচিত।

এবার বীরেন্দ্র বললেন, চল, এবার আমাদের খোঁজার কাজটা শেষ করে নিই।

আদিত্য উঠতে উঠতে বলল, আজ যদি চাবি পাওয়া যায় বা গুপ্তদরজা খুঁজে পাওয়া যায় ভাল, নাহলে পুলিশকে জানান উচিত। অবশ্য চাবি পাওয়া গেলেও তো খোঁজ দিতেই হবে, সরকারের বিনা অনুমতিতে···

কে আর জানতে যাচ্ছে—চেপে গেলেই হবে।—বলল জয়পাল।

তা তো হয় না, এটা আইন।

বীরেন্দ্র বললেন, আগে চল তো, পরে খোঁজ-খবরের কথা···'আয়া না খাও বৈদ্য বুলাও'। আগে আছে কিনা দেখ, তবে পুলিশ।

বিশাল শ্বেতপাথরের দালান পেরিয়ে, এল ভেতর বাড়ি। সেখানে দেখা হল চমনলালের সঙ্গে, সে চাবির গোছা নিয়ে তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিল। বেশ কয়েকটা অলিন্দ ঘুরে একটা প্রশস্ত বারান্দার সামনে গিয়ে পড়তে দেখল, পিছনে অপেক্ষাকৃত পুরানো আমলের একটি অংশ। নতুন অংশের সঙ্গে ঝুলন্ত ব্রীজ দিয়ে যোগ করা হয়েছে।

এই অংশের সঙ্গে অপর অংশের এত অমিল যে লোককে বলে দিতে হয় না। দু' বাড়ির জন্মসময় ভিন্ন।

ঝুলন্ত ব্রীজ দিয়ে ওরা এগিয়ে যায় পুরোনো প্রাসাদের দিকে।

আদিত্য মনে মনে নিজেকে সত্যসন্ধানী ভেবে নিয়েছে, তাই তার আচার-আচরণেও আপনা-আপনিই রহস্যভেদী ভাব এসে গেছে। মেঝের থেকে কড়িকাঠ সব কিছুই জরীপ করে সে। এ অংশও মূল্যবান সামগ্রী দিয়েই তৈরি। মার্বেলের দালান, বড় বড় ঝাড়বাতি, পাথরের মূর্তি—সব কিছুই রয়েছে, তবে অযত্ন হেতু একটু মলিন। বারান্দার কোলে সারি সারি দরজা, যার গায়ে বিশাল বিশাল তালা ঝুলছে।

বীরেন্দ্র সিং হঠাৎ চলা থামিয়ে কণ্ঠে কৌতুক মাখিয়ে বলেন, কিহে ডিটেকটিভ, এবার বল, কোন ঘরটা খুলব?

আদিত্য মাথা চুলকে বলল, 'দেখুন মিস্টার সিং, আমি গৃহস্থ ঘরের ছেলে। আমার পিতৃকুলে কেউ রাজা-জমিদার নেই, তাই আমি কি

করে বলি বলুন, কোন্‌টা আপনাদের শোবার ঘর হতে পারে। সে বরং আপনিই বলতে পারেন, কিম্বা মিস্টার জয়পাল বলতে পারেন।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে চারিধার ভাসিয়ে দিয়ে জয়পাল বলে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না! নামেই রাজা, পুকুরে ঘটি ডোবে না—এই অবস্থা আর কি। ওসব অভিজ্ঞতার কথা ছাড়ুন, প্রথম থেকেই দরজা-গুলো খুলে দেখা যাক না।

হ্যাঁ, সেই ভাল। —বীরেন্দ্র সিং বললেন।

চমনলালের দেখা গেল চাবি মুখস্থ। সে চট করে তালার মধ্যে চাবি লাগাল। মৃদু একটা আর্তনাদ করে তালাটা খুলে গেল। বোঝাই যায়, অব্যবহারের ফলে মরচে পড়ার জন্যেই এই আওয়াজ।

দরজা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে। বীরেন্দ্র বলেন, চমন, আগে জানলাগুলো খোল তো! যা অন্ধকার আর গুমোট ভাব, ঘরে ঢোকাই মুশকিল।

চমনলাল জামার পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করে জ্বালাল, তারপর ঘরে ঢুকল।

তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল আদিত্য। বলল, মিস্টার সিং, আপনার এই লোকটি কিন্তু খুব বুদ্ধিমান, সঙ্গে আবার টর্চ এনেছে।

প্রশংসায় ভগবান পর্যন্ত বশ হন, এ তো সামান্য চমনলাল।

কথাটা কানে যেতেই ফিরে দাঁড়িয়ে এক মুখ হেসে বলল, কি করব সাহেব, এই সব পুরোনো মহলে বড় বেশী সাপখোপ থাকে। এদিকটা তো ব্যবহার হয় না, তাই যখনই আসতে হয়, তখনই টর্চ নিয়ে আসি। এসব মহল তো এক দেওয়ালীর সময় খোলা হয়।

কথার রেশ ধরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের আর বুদ্ধি কি, বাবু-সাহেব—

তারপরে এগিয়ে গিয়ে জানলা খোলে।

বীরেন্দ্র সিংও বেশ খুশি হন চমনলালের প্রশংসা শুনে। পরের কথায় সেটা প্রকাশ পায়। বলেন, চমনের ভীষণ বুদ্ধি। একবার

যা করে ডাকাত তাড়িয়েছিল, সে শুনলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। ও কি আর আমাদের বাড়ি আজ থেকে আছে? ওর বাবা আমাদের বাড়ি কাজ করত, ঠাকুরদার খাস চাকর ছিল। পরে বাবার কাছেও কাজ করে এখানেই দেহ রেখেছে। তারপর চমনলাল, তার ছেলে কিষাণলাল আমাদের বাড়িতেই রয়েছে।

কথা আর এগোতে পারে না, ভেতর থেকে তাগাদা আসে ঃ আসুন হুজুররা।

চল, ভেতরে গিয়ে খোঁজ করি।

সদলবলে ঘরে ঢোকে। বিশাল ঘর। অবিন্যস্ত আসবাবপত্র ছড়ানো। রাজার বাড়িতে, বিশেষ একেবারে অন্দরমহলে ঢোকার সৌভাগ্য তো আদিত্যর হয়নি, তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিনিসগুলি দেখছিল। সিংহাসনের মত একটি চেয়ার যার হাতলগুলো রূপোর; বিশাল আয়না। আরো কয়েকটি কাঠের চেয়ার রয়েছে, যেগুলো দেখলে বোঝা যায় পরবর্তী কালের সম্ভবত অনাবশ্যক অব্যবহৃত তৈজসপত্র এদিকেই রাখে। সব থেকে আকর্ষক লাগল, এক কোণে রাখা শ্বেত পাথরের একটি চৌকির ওপর অনাদৃত ভাবে পড়ে থাকা বীণা আর তবলা দেখে।

গতকাল রাত্রে সঙ্গীত সভার কথা মনে হতে, আর এই অনাদরে রক্ষিত যন্ত্রগুলো দেখে কেমন বিসদৃশ ঠেকল। যে বাড়িতে এত গানের সমাদর, সেখানে যন্ত্রের এমন অবহেলা কেন? প্রশ্ন না করে পারে না আদিত্য, বলে মিস্টার সিং, গতকাল দেখলাম, আপনার বাড়িতে গানের আসর বসেছে। আর আজ দেখছি, সেই বাড়িতেই যন্ত্রের এই নিদারুণ অবস্থা। কেন?

প্রশ্নটা তুমি খুবই যুক্তিযুক্ত করেছ। এর আবার এক ইতিহাস আছে, সেটা শুনলে বুঝবে, কেন এই যন্ত্র নির্বাসিত।

কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, আমার এক ছোট ভাই ছিল। যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়ায় আর তেমনি সাহসী। সব

থেকে যেটা ছিল, তা হচ্ছে বাজনার হাত। লোকে কথায় কথায় বলে বাজনা শুনে জীবজন্তু বশ হয়, আমার ভাই সত্যিই বাজনায় সকলকে বশ করতে পারত। আমার ভাইয়ের নাম ছিল হীরেন্দ্র। ওর ওই নামটার পিছনে কাহিনী আছে। হীরার যেদিন জন্ম, সেদিন আমাদের পান্না স্টেটের বাগানবাড়িতে একটি বিরাট সাইজের হীরা উঠেছিল। —জান তো, পান্নায় জমি কাটলে, অনেক সময় হীরা পাওয়া যায়। হীরেন্দ্র বেশীর ভাগ সময় এই রুদ্রবীণাই বাজাত। আমাদের কুলগুরু বলেছিলেন, রুদ্রবীণা বাজানো উচিত নয়, সকলের সহ্য হয় না। হীরেন্দ্র হাসত, বলত, অসহ্য হলে আর কি হবে, আমি মরে যাব। কুলগুরু বলতেন, দেখ বেটা, তোমার হয়তো সংসার ভাল লাগবে না, এমনও হতে পারে। কি দরকার, অন্য কত যন্ত্র রয়েছে, তাই বাজাও না। কুলগুরু বারণ করেছিলেন বলেই যেন ওর জেদ চড়ে গেল, আর হীরেন্দ্র সব বাজনা ছেড়ে শুধু রুদ্রবীণাই বাজাত।

তারপর ?

আদিত্য যেন দূরাগত বীণার ঝঙ্কার শুনতে পায়। দেখতে পায় কন্দর্পকান্তি এক তরুণ দু' চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বীণা বাজাচ্ছে।

বীরেন্দ্র বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তারপর কি হল জান ? হঠাৎ হীরেন্দ্রর মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। বদ্যি এলেন। বললেন, এ তো রাজরোগ হয়েছে, আমার দ্বারা একে সুস্থ করা সম্ভব হবে না। মনে হয়, ছোট রাজকুমারকে বড় কোন শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

বৈদ্যের কথা মত হীরেন্দ্রকে ঝাঁসি নিয়ে যাওয়া হল। চিকিৎসায় বেশ উন্নতি হচ্ছিল, হঠাৎ একদিন কি করে ও সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল —আমার জন্যে চিন্তা করো না! আমি ভাল থাকব। সংসার আমার ভাল লাগছে না, তাই চলে যাচ্ছি।

অনেক খোঁজ-খবর করা হল, কিন্তু হীরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না।

ও চলে যাবার পর, বছরখানেক পরে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিল, হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বেশ লাগছে। তবে, বীণার জন্যে বড় মন কেমন করে।

আদিত্য এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল—জয়পালও তাই। এবার আদিত্য প্রশ্ন করল, আর খবর পান নি ?

হ্যাঁ, পেয়েছি। এখানকার এক পণ্ডিত, একবার কুম্ভমেলায় হীরেন্দ্রকে দেখেছিল।

কতদিন আগে ?

বেশি নয়, এই বছর তিন-চার হবে। পণ্ডিত চিনতে পারে নি। আর পারবেই বা কি করে, জটাজ্‌টধারী সন্ন্যাসীকে চেনা কি অত সহজ ? হীরেন্দ্র নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল। পণ্ডিত তখন তাকে বাড়ি ফিরে আসতে বলে। তার উত্তরে সে বলে, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে আমি একটা জিনিস খুঁজছি, সেটা পেলেই আসব।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে আসে।

বীরেন্দ্র সিং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করুণ সুরে বলেন, চারিধারে এত শত্রু, এই সময় নিজের ভাইটা যদি কাছে থাকত। ···চল, আমরা আমাদের কাজ করি।

জয়পাল এতক্ষণে কথা বলল : আমার তো মনে হচ্ছে, এটা শোবার ঘর নয়। অন্য ঘরগুলো দেখলে হত না ?

কথাটা শেষ করে সমর্থনের আশায় আদিত্যর দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।—তাড়াতাড়ি আদিত্য বলে।

চমনলাল, ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে ঘর বন্ধ করে। ততক্ষণে দ্বিতীয় দরজার কাছে ওরা পৌঁছে গেছে।

দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আদিত্যের হঠাৎ নজর পড়ে চতুর্থ দরজাটির ওপর। এই দরজাটির কেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যগুলো কাঠের দরজা, এটি ধাতুর—সম্ভবতঃ পিতলের।

ও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই দরজাটার কাছে যায়। দরজার গায়ে টোকা দিয়ে দেখে—ধাতুরই তৈরী। ভাল ক'রে লক্ষ্য করে—না পিতলের নয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে দরজার একটা কোণা ঘ'সতে ঘ'সতে সাদা রং বেরিয়ে আসে। এ নিশ্চয় রূপো।

ধুলো জমা দরজাটা দেখলে কে বুঝবে এটা রূপোর। ভালভাবে নিরীক্ষণ করে আদিত্য। এক সময় তার দৃষ্টিটা দরজার চাবির কাছে প'ড়তে চমকে ওঠে, আশ্চর্য! অব্যবহৃত দরজার চাবির কাছটা বেশ চক্‌চক্ ক'রছে, মনে হয় যেন প্রায়ই কেউ এতে হাত দেয়!

একটা চিন্তা বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমকে ওঠে। এ ঘরটাই বোধহয় শোবার ঘর, আর সে খবর বোধহয় অপরদল পেয়েছে।

আদিত্য এবার অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল। চমন ততক্ষণে দ্বিতীয় দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। সে বলে—চমনলাল, ও দরজাটা থাক, এটাই আগে খোলো।

চমন চাবির গোছা নিয়ে এগিয়ে এসে বলে—সাহেব, একটা কথা ব'লছি, এ ঘরটায় না যাওয়াই ভাল।

বিস্মিত আদিত্য—কেন চমন? ভয় কি? দিন দুপুরে কি হবে, আর আমরা এতগুলো মানুষ!

চমন কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম ক'রে বলে—বাবু, আপনারা ইংরাজী পড়া লোক তাই অনেক কিছু বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এমন সব জিনিস আছে যা লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র, দিনদুপুর কিছুই মানে না।

—ঠিক আছে চাবিটা আমায় দাও, আমিই যাচ্ছি।

এক হাত জিভ কেটে চমনলাল বলে—ছিঃ ছিঃ। সেকি কথা, আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহেমান, আপনাকে কখনও আমি বিপদের মুখে পাঠাতে পারি!

কথা হ'তে হ'তে বীরেন্দ্র এগিয়ে আসেন—ব্যাপার কি, এত বচসা কিসের?

চমন তাড়াতাড়ি বলে—ও কিছু না।

এবার সে দরজা খোলে। কোন ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ না করেই দরজাটা খুলে গেল। আগের ঘরের মত ভ্যাপসা গন্ধ নয় বরং ধুলোবালির গন্ধ ভেসে এলো।

চমন ব'লল—আপনারা দাঁড়ান, আমি ঘরে গিয়ে জানলা খুলছি।

সে টর্চ জ্বেলে ঘরে ঢুকল। এরা তিনজন বাইরে অপেক্ষা ক'রতে লাগল। আদিত্য দেখল, এই দিনমানেই ঘরটা কী ভীষণ অন্ধকার। হঠাৎ চমনলাল একটা বিকট চিৎকার ক'রে ওঠে।

তিনজনে প্রায় একই সঙ্গে বলে—কি হয়েছে? এক সঙ্গেই ঘরে ঢোকার জন্যে পা বাড়ায়।

ততক্ষণে চমনলাল হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের বাইরে এসে গেছে। দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সে ভয়াবহ কিছু দেখেছে। সকলের চোখেই তখন জিজ্ঞাসু ভাব।

বাইরের খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নিয়ে চমন অনেকটা সুস্থ হয়।

জয়পাল এগিয়ে গিয়ে চমনলালের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করে—কি হ'ল চমন, তুমি অমন ক'রলে কেন?

কাঁপা কাঁপা গলায় চমন বলে—মামাবাহাদুর, যা দেখেছি তা মুখে ব'লতে পারব না।

– তবু বল কি রকম, ঘরে ঢুকে কি হ'লো?

—আমি টর্চ জ্বেলে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি আর এক একবার এক এক দিকে আলো ফেলছি। হঠাৎ দেখি দুটো চোখ জ্বলে উঠল, আমি ভয়ে ভীষণ চিৎকার ক'রে চোখ বুজে নিলাম।

—তারপর?

—তারপর বাইরে আসার সময় আর একবার আলো ফেলতে দেখি বিশাল একটা সাপ ফণা ঘুরিয়ে নিচ্ছে···আমি আর দেখিনি।

জয়পাল ব'লল—ওহ তাহ'লে সাপ দেখেছ। ও কিছু না। চল তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।

—না, না মামাবাহাত্বর, শেষে···

—শেষে আবার কি ? চল।

আদিত্য বলে—চলুন আমরা এক সঙ্গেই যাই।

জয়পাল হেসে বলে—আপনি পরদেশী মানুষ, এখানকার ঘর-বাড়ির সঙ্গে পরিচিত নন। একটু অপেক্ষা করুন, আমি আর চমন গিয়ে জানালাগুলো খুলি তারপর যাবেন।

তাই হ'লো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জয়পালের গলা শোনা গেল—এবার আপনারা আসুন।

প্রশস্ত ঘর। মার্বেলের মেঝে, যদিও বহুদিনের ধুলো জমে আছে তবু মনে হয় এখানে মাঝে মাঝে কেউ আসে, কিংবা কেউ ঝাড়ু দেয়।

এবার আদিত্য পরীক্ষা ক'রতে লাগল, এটা শেবার ঘর হতে পারে কি না। শোবার ঘর হ'লে একটা পালঙ্ক থাকা দরকার, এখানে কিন্তু কোন খাট নেই। হয়তো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মনে পড়ে গেল কুলুঙ্গির কথা। রয়েছে, অনেকগুলি কুলুঙ্গিই আছে।

আদিত্য এগিয়ে গেল একটি কুলুঙ্গির কাছে। শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী। কিন্তু সেখানে কোন দেবী মূর্তি নেই। খালি। ও পর পর কুলুঙ্গিগুলো দেখতে লাগল। একটা কুলুঙ্গিতে হাত রাখতেই পাথরটা ন'ড়ে উঠল। মনে মনে চমকে উঠলেও মুখে কিছু ব'লল না। সকলের নজর এড়িয়ে পাথরটা তুলে দেখল সেখানে কেউ গর্ত করার চেষ্টা ক'রেছে। পরের কুলুঙ্গিটায় সন্ধানী চোখ দিয়ে দেখে মনে হলো কেউ এটিকেও খুলেছিল এবং পরে সিমেন্ট দিয়ে আটকে দিয়েছে। সাবধানে কাজ ক'রলেও চারিধারে এখনও সিমেন্টের ছিটে-ফোঁটা লেগে আছে।

আদিত্য মনে মনে ভাবে অপর পক্ষ তা হ'লে এ ঘরে অভিযান চালিয়েছে। একবার ভাবল বীরেন্দ্রকে ব্যাপারটা বলে, কিন্তু পরে কি ভেবে থেমে গেল।

জয়পাল গলা তুলে বলল—আরে বাঙ্গালীবাবু, বুন্দেলখণ্ডের রাজ-

বাড়ির আসবাব পত্র, মার্বেল, মেহগিনী বাদ দিয়ে শেষে কুলুঙ্গি দেখে বেড়াচ্ছেন ? আরে, এদিকে আসুন, দেখুন রিয়াল খাজানা তো এইখানে !

আদিত্য ও হেসে ব'লল—ভাই খাজানা কার যে কোথায় সে কি কেউ আগে থেকে জানতে পারে ? উপরওয়ালা যখন হাত ধ'রে খাজানার কাছে নিয়ে যায় তখনই আমরা জানতে পারি।

কথা ব'লতে ব'লতে এগিয়ে যায় ঘরের অন্য কোণের দিকে, সেখানে একটি চৌকি পাতা। তার ওপরে রাজ্যের জিনিস, কাঁচের বাতিদান, পাথরের ফুলদানী, জরির কাজ করা ভেলভেটের চাদর, গড়গড়ার নল, পাখার হাতল, পিকদানী, পানের ডিবে, আরও হাবি-জাবি কত জিনিস।

চমনই একটা একটা ক'রে সরাচ্ছিল।

আদিত্য পানের ডিবেটা কিসের দেখার জন্যে এগোতে গেলে খাটের তলায় রাখা কিছু তার পায়ে লাগল। হেঁট হয়ে দেখল বস্তায় মোড়া কি যেন রয়েছে।

সে ব'লল—চমন, দেখতো এখানে কি রয়েছে।

চমন তাড়াতাড়ি এসে ব'ললে—দেখি কি।

বস্তা টেনে বার না ক'রে ফাঁক ক'রে দেখে ব'লল—ও কিছু না, কয়েকটা মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি।

—মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি ! আশ্চর্য !

বীরেন্দ্রের কণ্ঠে সত্যই বিস্ময় ফুটে ওঠে।—এখানে ও সব এলো কি করে ? বার করতো দেখি।

চমন বার করল—গাঁইতি, সাবল, কর্নিক ইত্যাদি দেখা গেল !

চমন ব'লল—হুজুর মনে নেই, ঝুল বারান্দায় মিস্ত্রিরা কাজ করেছিল। এগুলো সেই সব যন্ত্রপাতি।

—তাই বল। যাক ওগুলো রাখ। এবার যেগুলো দেখাচ্ছিলে, সেগুলোই দেখাও।

চমন আবার স্তূপাকৃতি বস্তু থেকে একটা একটা করে জিনিস আলাদা ক'রতে থাকে।

আদিত্যের মন কিন্তু ঐ বস্তায় মোড়া যন্ত্রপাতির দিকেই পড়ে রইল। সবার অলক্ষ্যে সে দিকেই খর দৃষ্টি দিতে থাকে, হঠাৎ তার নজরে পড়ে বস্তার নীচে সাদা রং-এর কিছু উঁকি দিচ্ছে। সকলে যখন অন্যমনস্ক আদিত্য এক ফাঁকে সেটি টেনে আনে, দেখে একটি রুমাল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেটে রেখে দেয়।

হঠাৎ বীরেন্দ্র চেঁচিয়ে ওঠেন—আরে এইতো দেবীমূর্তি!

আদিত্যও প্রায় চিৎকার করে ওঠে—এইতো সেই মূর্তি!

সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ ওটির ওপরই পড়ে।

বীরেন্দ্র সিং তাড়াতাড়ি মূর্তিটি তুলে নিলেন। বেশীক্ষণ হাতে ধরে রাখতে পারলেন না, এত ভারি। আবার চৌকির এক প্রান্তে বসিয়ে দিলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে আদিত্যের দিকে চেয়ে ব'ললেন, এবার বল কি চাও?

হেসেই সে উত্তর দিল—খড়্গ চাই।

আচ্ছা দিচ্ছি—বলে দেবী মূর্তির দিকে ঝুঁকে খড়্গ আনতে গিয়েই বলে উঠলেন, আরে, খড়্গটা তো দেখছি না।

কোথায় আর যাবে, এখানেই কোথাও প'ড়েছে বোধ হয়।

কথাটা শুনে প্রত্যেকেই বেশ উদ্বিগ্ন হ'লো। সকলেই চৌকির ওপরকার আবর্জনা সরিয়ে ওটা খুঁজতে লাগল। সম্ভব, অসম্ভব সব জায়গাতেই খোঁজা হলো, কিন্তু সেই খাঁড়া বা চাবির হদিস পাওয়া গেল না।

বীরেন্দ্র কতকটা ক্লান্ত হ'য়েই বললেন, আজ এখানেই থাক, কাল আবার খুঁজলেই হবে।

আদিত্যের মন সায় দিচ্ছিল না, তাই কিন্তু কিন্তু করে বলল—মিঃ সিং, আর একটু দেখলে ক্ষতি কি? ওটা তো আমাদের বিশেষ দরকার।

—এত ব্যস্ততার কি আছে, আজ না হয় কাল হবে। ভয়েরও কিছু

নেই। আমরা ছাড়া ঘরে বাইরের লোক কেন পিঁপড়ে পর্যন্ত সিঁধুতে পারে না।

আদিত্য বীরেন্দ্রের কথার ভুল সংশোধন করে ব'লল—আপনার কথা ঠিক নয়, একটু আগেই তো দেখলেন নাগরাজ ঢুকেছিলেন।

বীরেন্দ্র হো হো করে হেসে বললে—ঠিক ধরেছ কিন্তু তবুও ব'লব আজ এই পর্যন্ত থাক।

—ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত থাক।

কোন কাজ অর্ধসমাপ্ত রাখতে চায় না আদিত্য। তা যদি চাইত, তবে, কবেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেত, পরের গুপ্তধনে তার দরকারই বা কি ? কিন্তু এখানে তো জোর করতে পারে না। বাধ্য হয়েই ফিরে চ'লল যে যার ঘরের দিকে।

নিজের ঘরে এসে আদিত্য বিছানায় নিজের শরীরটাকে ঢেলে দিল। চিন্তাগুলো একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা, একের পর এক ভাবতে চেষ্টা করল। চোখ বাঁধার কথা মনে হতেই একটু আগে কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটার কথাও মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে রুমালটা বার করতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো। এই গন্ধটা যেন আগে কোথায় পেয়েছে। মনে পড়ল না। তবে এটা ঠিক এখানে কেউ আসে আর সে বেশ রহিশ।

রুমালের চিন্তা ছেড়ে আদিত্য ভাবতে লাগল, যে ব্যক্তি প্রথম নক্সাটা নিয়ে এসেছে তার তো ধনভাণ্ডারের পথ জানার কথা নয়, তবে এ আবার কে ? কিংবা সে কি এতই চতুর যে জটাধারী বাবাকে ফাঁকি দিয়ে পথটা জেনে নিয়েছিল ?

"কি, ঘুমচ্ছেন নাকি ?"

ব'লতে ব'লতে হাসিখুশি মুখে জয়পাল ঢুকল। তার প্রাণবন্ত, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখলে যেন মনের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়।

—না, না ঘুমব কেন, ভাবছি, আসুন আসুন।

—দেখো আদিত্য, আমি বাপু অত ভদ্রতা টদ্রতার ধার ধারি না,

তাই একান্ত অনুরোধ তুমি আমাকে আপনি টাপনি বলো না। আর এত চিন্তাই বা কিসের ?

—ওই যে গুপ্তধনের।

—আরে রাখ তোমার গুপ্তধন, সে তো এতদিন লুপ্ত হ'য়েই ছিল, এখন আবার তাকে টেনে বার করতে যাচ্ছ কেন ?

—একজন সন্ন্যাসী যে আমার ওপর ভার দিয়েছেন।

—তাঁর কথা তো রাখা হয়েছে, যার জিনিস তাকে দিয়েছ, তবে আবার চিন্তা কিসের ?

—আর একটা দল যে মিঃ সিং-এর বিরুদ্ধে কাজ ক'রছে তাই তো ভয়···আচ্ছা জয়পাল, এ বাড়িতে তো অনেক লোক আছে আমি সবাইকে চিনিও না, তোমার কাকে সন্দেহ হয় ?

—এই দেখ, আমাকে আবার চিন্তার মধ্যে ফেললে। ব'লেছি না ওসব আমার ভাল লাগে না।

—তবু তোমার তো একটা ধারণা আছে এই বাড়ির লোকেদের সম্পর্কে, তাই বল না।

—নিজের লোককে ভাল বলা বা ভাল ভাবা তো নতুন কিছু নয়, আমার বোন, ভগ্নিপোতকে ভাল লাগা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

—তাঁদের বাদ দিয়েই বল।

—আমি কারুর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না, তবে তুমি যখন জিজ্ঞেস ক'রছ তখন বলছি ঐ হরবংশকে আমার ভাল লাগে না।

—কোন প্রমাণ পেয়েছ ?

—না, তেমন কিছু পাইনি, তবে আমার ভগ্নিপোতের যে টায়ারের কারবার আছে তাতে ও কিছু কারচুপি করে বলে আমার মনে হয়।

—মিঃ সিংকে বল না কেন ?

—লজ্জা করে আবার ভয়ও হয়, কারণ হরবংশ এখানকার বহুদিনের লোক, আমি তো নেহাতই কুটুম।

—তোমার যদি লজ্জা করে তবে তোমার দিদিকে বল না কেন ?

—ও যে বড্ড শান্ত, বড্ড ভাল, ওকে বলে কোন লাভ হবে না।

—তা হলে তুমিই একটু নজর রাখ না কেন ?

—আমি যে সব সময় থাকি না। যে সময় থাকি তখন চেষ্টা করি নজর রাখার।

এই সময় চমনলাল ঢুকল—আরে মামা সাহেব, আপনি এখানে ? আমি যে আপনাকে সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—বাবা, ব্যাপার কি ? এত খোঁজাখুঁজি ?

—রানীমা ডাকছেন। আর খাবারও তো সময় হ'লো, হুঁস আছে ?

জয়পাল তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে যায়।

রাজসিক দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর না শুয়ে আর থাকতে পারে না —তাছাড়া গত ক'দিনের ক্লান্তিও ছিল। বেশ টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠে, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে।

চমনলাল যেন মন্ত্র জানে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই চা নিয়ে এল। লোকটিকে আদিত্যের খুব ভাল লাগে, সে যেন আদর্শ গৃহভৃত্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে হয়। বলে, চমনলাল, তুমি একা মানুষ, এত কাজ কর কি করে? ঘরের কাজ, আবার অতিথিসেবা।

অমায়িকভাবে হেসে চমনলাল বলে, না সাহেব, আমার কাজ তো বেশি নেই, দায়িত্বই বেশি। এ বাড়িতে দাস-দাসী আছে প্রায় চল্লিশ জন, সবার খবরদারী আমাকেই করতে হয়।

তাহলে তো, তুমি সর্দার।

বিনীত ভাবে হেসে সে উত্তর দেয়, কথাটা ঠিকই বলেছেন হুজুর।

কৌতুক করে আদিত্য বলে, তবে আমার মত সাধারণ লোককে দেখার ভার তোমার ওপর যে?

এক হাত জিভ কেটে, দু'হাতে নিজের কানের লতি ধরে বলে, কি বলছেন হুজুর, আপনি আমাদের সব থেকে সম্মানিত মেহমান। রাজা-সাহেব বলেছেন, বাঙালীবাবুকে খুব আদর যত্ন করবে, তাঁর যাতে কোন কষ্ট না হয়।

চমনলালের কথায় বেশ মজা লাগে আদিত্যের। বলে, সম্মানিত অতিথি কি করে হলাম? আমি তো রাজাও নই, বাদশাও নই—অতি সাধারণ লোক।

আপনি অনেক বড় হুজুর, না হলে কি আর এত সম্পত্তির লোভ··· না, না, ও কিছু নয়, ছোট-মুখে বড়-কথা না বলাই ভাল।

বসে বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ উঠে পড়ে, ঘুরে চলতে আরম্ভ করে। আবার থেমে যায়। তারপর মাথা ঘুরিয়ে বলে, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, রাজাসাহেব কাল ভোরেই টিকমগড় রওনা হবেন। উনি অবশ্য বলেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

কাজ আছে বুঝি ?

না, কাজ নয়। ওখানকার রাজকুমারের বিয়ে—সেই উপলক্ষে যাবেন। রানীমা যাবেন না।

ক'দিন বাদে ফিরবেন ?

আমি ঠিক জানি না হুজুর। মনে হয়, এক সপ্তাহ লেগে যাবে। বড় রাজকুমারের বিয়ে তো।

আচ্ছা চমনলাল, কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় বল তো ? বিকেলে বাড়ির মধ্যে ভাল লাগছে না।

নদীর ধারে যান না, ভালো লাগবে।

কত দূর এখান থেকে ?

এই তো একটুখানি। বড় রাস্তায় গিয়ে বাঁ দিকে হাঁটবেন, বেশি দূর যেতে হবে না। একটা রাস্তা পুবের পানে চলে গেছে, সেটা দিয়ে কয়েক পা গেলেই নদী। বড় সুন্দর জায়গা। আর নদীতে ভর্তি মাছ।

বাঙালী বলে আদিত্যকে যেন প্রলোভন দেখাচ্ছে, তেমনি লঘু ভাব চমনলালের কণ্ঠে। শুনে হেসে উঠে আদিত্য বলে, তবে তো যেতেই হবে! মাছ খেতে পাই না পাই, দেখতে তো পাব।

চমনলাল এবার বেশ গুরুগম্ভীর মুখে বলে, হুজুর, একা যাবেন না, নতুন লোক। সঙ্গে দারোয়ানকে নিয়ে যান। একে সকালে ওই কাণ্ড হল, ভাবলে, বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

ভয়ের কিছু নেই, চমনলাল। নতুন হতে পারি, ছেলেমানুষ তো

নই—হারাব আর কি করে ? যদি কেউ শত্রুতা করে, তবে দারোয়ানই কি বাঁচতে পারবে ?···আচ্ছা, তুমি যাও।

চমনলাল চলে যাবার পর আদিত্য উঠে পড়ে পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বীরেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি বলতে গেলে বড় রাস্তার ওপরই, তবে বাগানের পথ পেরিয়ে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সকালে আদিত্য গিয়েছিল প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে। আজ যাচ্ছে সোজা পুব মুখে। অবশ্য এ পথে গতকাল এসেছিল, কিন্তু কোন দিকে ভাল করে তাকায় নি। কারণ মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ ছিল। আজ নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে।

দেউড়ি থেকে রাজপথ পর্যন্ত বিশাল চওড়া লাল পাথরের পথ, যার দু'ধারে সাদা পাথরের পাড় দেওয়া। সব থেকে সুন্দর লাল রাস্তার পাশে দু'দিকে দু'সারি সমান দূরত্বে আর প্রায় সমান উচ্চতা বিশিষ্ট অর্জুন গাছ দৃপ্ত ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপথে উঠে নদীর দিকে যাবার জন্যে হাঁটতে আরম্ভ করে। তার পায়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তার ধারাও বয়ে যায়। সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান হরবংশ সিংয়ের হাতের আংটিটার কথাও মনে এসে যায়। সকালে অতর্কিতে যখন তাকে চেপে ধরেছিল, তখন সে অনেক চেষ্টা করেছিল ছাড়াবার, সে সময়েই হাতে ঠেকেছিল বিশাল মাপের এক আংটি।···তবু কিছুতেই বুঝতে পারছে না, দেওয়ান কেন তার চোখ টিপে ধরবে। তবে কি গুপ্তধনের কথা ওকে অন্য কেউ বলেছে ? যদি তাই হয়, তবে বোঝা যাচ্ছে, আদিত্যের পিছনে বেশ একটা ষড়যন্ত্র চলছে। হঠাৎ একটা ভয় শিরশির করে মনের ওপর দিয়ে চলে গেল।···চমনলালের কথাটা শুনলেই হত।

বেশি দূর সত্যিই যেতে হল না, পূর্বগামী পথ এসে পড়ল। সে পথে নেমে একটু হাঁটতেই চমৎকার একটি নদীর ধারে এসে পড়ল। নদীর ধার সুন্দর বাঁধান। দেখলেই বোঝা যায়, স্নানের জন্য তৈরি করা।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর দেখল, নদীর ঘাটে শুধু স্নানের সিঁড়িই নয়, বিশেষ ভাবে ধাপে ধাপে বসার জায়গা। জলের মধ্যে একটি ঘরের মত। প্রথমটায় আদিত্য বুঝতে পারে নি ওটা কি। পরে মনে হল, এখানে নিশ্চয় রাজপরিবারের মহিলারা স্নান করেন।

এখন ঘাট শূন্য। পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসে আদিত্য নিজের মনে গুনগুন করে গান করতে লাগল।

এক সময় গান থামার পরই শুনল বালক কণ্ঠের ডাক : সাহেব!

আশ্চর্য, এখানে তো কাউকে দেখে নি! মুখ ফিরিয়ে দেখল, বছর দশেকের একটি ছেলে।

আদিত্যের কৌতূহল হল। হাসি মুখে উত্তর দিল : কি বলছ?

চিঠি।

চিঠি?

হ্যাঁ! মোটরওয়ালাবাবু যে বলল, তোমার একটা চিঠি আছে। এই দেখ না।...হাতে ধরা খামটা আদিত্যের দিকে তুলে ধরে।

অবাক বিস্ময়ে দেখে, সত্যি, তারই নাম লেখা একটা খাম। হাত বাড়ায় সেটা নেবার জন্যে, অমনি ছেলেটা পিছিয়ে যায়।

আদিত্য একটু বিরক্তই হয়।...কি হল? দাও!

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে বলে, দেব না। আগে পয়সা দাও।

কথা বাড়াতে ভাল লাগছিল না, তাই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিতেই, সে কাছে এসে আগে বাঁ হাতে নোটটা নেয়, তারপর ডান হাতে ধরা চিঠিটা এগিয়ে দেয়।

অত চিন্তার মধ্যেও ছেলেটির পয়সা সম্বন্ধে সতর্কতা দেখে আদিত্যের মজা লাগে। ছেলেটি আগে টাকা নিল, তারপর চিঠি দিল।

খামটি হাতে দিয়ে ছেলেটি এক দৌড়ে চলে গেল। আদিত্যের মনে হল, ওকে তো জিজ্ঞাসা করা হল না যে, যে চিঠিটা দিয়েছে, সে দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গলা তুলে ডাকল : এই বাচ্চা···এই বাচ্চা!

কিন্তু ফল হল না। হয় সে শুনতে পেল না, অথবা শুনেও ফিরে তাকাল না।

করার কিছু নেই। আবার বেঞ্চিতে বসে পড়ল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল চিঠিটা। হাতের লেখা নয়, টাইপ করা। চিঠিটা খুলে ফেলল।

সম্বোধনহীন চিঠি : "প্রাণের মায়া সকলের আছে। আশা করি, তোমারও আছে। টাকার মায়া যে নেই তা তো বুঝতেই পারছি; নাহলে আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছ। টাকার মায়া থাকলে বলতাম যে, গুপ্তধন পেলে আধাআধি ভাগ হবে; কিন্তু তাতে লাভ নেই, তোমার ক্ষেত্রে তাই প্রাণের কথাই বলি।

একটা রাত দিলাম চিন্তা করার জন্য, ভেবে নাও, কি করবে। তোমার কাছে যে দলিলপত্র আছে, সেগুলো যদি আমাদের দিয়ে দাও, তাহলে তো বলার কিছুই নেই। কিন্তু যদি না দাও বা এই কথা বীরেন্দ্র সিংকে বল, তবে তুমি আর নিজের দেশে ফিরতে পারবে না। সকালে বলেছিলে, কাগজপত্র তোমার কাছে নেই। যদি সেকথা সত্যি হয়, তবে আজই বীরেন্দ্রর কাছে চেয়ে নাও। নাহলে আমাদের লিখে জানাও, গুপ্তভাণ্ডারে যাবার পথ কোথায়? ওই চিঠিটা আগামীকাল এই রকম সময়ে বীরতালাওয়ের পশ্চিম পাড়ের অশ্বত্থ গাছের তলায় বেদীর ওপর রেখে দিও।

আশা করব, বাঙালী এত বোকা হবে না যে, পরের ব্যাপারে নাকটা গলিয়ে নিজের প্রাণটা বেঘোরে হারাবে। আশা করি চিঠির কথা গোপন থাকবে।"

একবার নয়, বার তিনেক চিঠিটা পড়ল। কে বা কারা যে এর পেছনে আছে, তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু যেই থাক, তারা বেশ হুঁশিয়ার লোক। ঠিক এই মুহূর্তে আদিত্যের নিজের কথা মনে এল না, বীরেন্দ্রর জন্যেই মনটা কেমন করে উঠল, বেচারা!

চিঠিটা পাট করে খামে ভরে পকেটে রাখতে গিয়ে একটা সুন্দর মৃদু গন্ধ পেল। গন্ধটা যেন চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় এই গন্ধটা পেয়েছিল, মনে করতে পারল না। আর দেরি করা ঠিক হবে না। একে নির্জন জায়গা। গা'টা একবার যেন ছমছম করে উঠল। সাবধানের মার নেই। বোকার মত কোন কাজ না করে, প্রাণ দিয়ে আর কি লাভ হবে!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রাজপথের দিকে এগিয়ে গেল। নদীর পথটা যেখানে বড় রাস্তায় মিশেছে, ঠিক সেইখানে পথের ধারে শাল সেগুন আর লতানে গাছ এমন গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে যে মনে হয় বিশাল একটা দেওয়াল। ফলে বড় রাস্তার বেশ কতকটা অংশ ভালভাবে দেখা যায় না। মোড়ের কাছে এসে ওই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগোতেই কানে গেল : বীরেন্দ্র সিং তো এখন এক সপ্তাহের জন্যে টিকমগড় যাচ্ছে, যা করবার এই সময়েই করে ফেলতে হবে।

ভাগ সমান সমান তো!

গলার স্বরটা আদিত্যের চেনা। হরবংশ সিং। সন্তর্পণে আর একটু এগিয়ে গিয়ে গাছের পাতার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, অপর ব্যক্তিটি কে?

চিনতে পারল না—কিন্তু মুগ্ধ হল তার রূপ দেখে। নিশ্চয় রাজ পরিবারেরই কেউ। সাদা বিশাল এক ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই ঘোড়ার মালিক উনিই। হরবংশ সিংও গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল।

রাজপুরুষ বলল, চিঠি পাঠান হয়েছে?

একটু গর্বিত ভাবেই হরবংশ উত্তর দেয় : আমার কাজে কখনও ফাঁক পেয়েছেন কি, কুমার বাহাদুর?

না, না, তা আমি বলছি না। সে তো জানিই, তুমি যেভাবে বীরেন্দ্রর বিশ্বস্ত সেজে কাজ করছ, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

একি কথা বলছেন আপনি···আমিই কৃতজ্ঞ যে, আপনি এই কাজে আমাকে নিয়েছেন।···হ্যাঁ, জেনে রাখুন, চিঠি আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করছি, কাল উত্তর পাব।

হরবংশের কথা শুনতে শুনতেই রাজপুরুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে পড়লেন। তারপর ঘোড়াকে চলার ইঙ্গিত দিয়ে তার দিকে ফিরে বললেন, উত্তরের আশায় রইলাম। চলি।

আদিত্য যেদিকে যাবে, তার বিপরীত দিকে রাজপুরুষটি চলে গেলেন। হরবংশও তারপর গাড়িতে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দেয়।

আদিত্য অপেক্ষা করে, গাড়িটা চোখের বাইরে চলে যাবার। আর ভাবে, কে এই রাজপুরুষ? তবে কি ছত্তর পাল?

মোটরটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পথে নামল আদিত্য। মনটা বেশ ভার লাগছে। এত চেষ্টার পরও যদি তরী কূলে না ভেড়াতে পারে, তাতে আর কি লাভ! আজ বীরেন্দ্র সিং মাঝপথে কেন যে খড়্গ খোঁজাটা বন্ধ করলেন—এখন সাতদিন শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। এর মধ্যে এরা কতদূর এগোবে কে জানে।

কিছুক্ষণ পরে ওর মনে হল, দরকার কি গুপ্তধন উদ্ধার করে, নিজের দিক থেকে সে তো সৎ রইল। যার জিনিস তাকে পৌঁছে দিয়েছে, যার ছাগল, সে লেজের দিকে কাটুক আর মাথার দিকেই কাটুক, তাতে ওর যাওয়াই ভাল।

বীরেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি এসে গিয়েছিল। লাল পথ ধরে দেউড়ীর কাছ বরাবর এসে হঠাৎ মনে হল, একবার বীর তালাওয়ের কাছে গিয়ে দেখে এলে হয়, নতুন কোন কাজ হয়েছে নাকি!

দু-চার পা গেছে, এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুনল ঃ হুজুর, এই সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাচ্ছেন?

চমনলালের গলা।

স্মিত মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে আদিত্য বলে, চমনলাল, তুমি আমাকে এমনভাবে সামলাচ্ছ, যেন আমি নেহাৎই নাবালক।

তা নয়, হুজুর, আপনি হলেন শহুরে মানুষ, দেশ গ্রামের কথা জানেন না কিছু। এ আবার বুন্দেলখণ্ডের জায়গা—যত পাহাড়ী সাপ থাকে এখানে। দেখতে ছোট, কিন্তু একটু ছুঁয়েছে কি ব্যস। তাই ভয় হয় হুজুর।

ঠিক আছে আমি সাবধানেই যাব। আমার কাছে টর্চ আছে, কোন চিন্তা নেই।

চমনলাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিল।

সকালে দেখা সেই বেদীর কাছ বরাবর যেতেই আধো আলো আধো অন্ধকারে মনে হল, কি যেন একটা নড়ছে। আদিত্য তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বেলে ওই দিকেই নিশানা করল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক উঠে দাঁড়াল। আধ-পাগল মত চেহারা। আদিত্যর দিকে কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে হঠাৎ দৌড়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল।

কে এই লোকটা? আর কি বা করছিল?

সমাধানের আশা যেন দূর থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে। আদিত্যের মনটা ততই ভারাক্রান্ত হচ্ছে।

রাত তখন কত হবে আদিত্য জানে না। হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালের ঘটনার পর থেকে ও বেশ সতর্ক হয়েই আছে। নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে জানালা দিয়ে দেখল, দুজন লোক। কি কথা বলছে কিছুই শোনা গেল না। মানুষগুলোকেও বোঝা গেল না। কারণ তারা আপাদমস্তক ঢাকা কালো বোরখার মত কি যেন পরে আছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখতে থাকে আদিত্য। যদিও চিঠিতে লিখেছে আজকের দিনটা ওকে সময় দেওয়া হয়েছে চিন্তা করার জন্যে, তবু বিশ্বাস কি?

দম আটকান অবস্থায় চ'লল কিছুক্ষণ। আদিত্যের মনে হ'লো

যদি তার শ্রবণ শক্তিটা আরও কিছু বেশী হ'তো তা হলে শত্রু পক্ষের সব প্ল্যান বুঝে ফেলত।

অনেকক্ষণ সলাপরামর্শের পর মূর্তি দুটি সচল হলো। পিছু নিলে কেমন হয়? না থাক দরকার নেই।

এমনি দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে থাকে আদিত্য। ভাবে ওদের কাছে নিশ্চয়ই পিস্তল বা ঐ জাতীয় কিছু আছে কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। দরকার কী অকারণে প্রাণটা খোয়াবার। কোন সৎ কাজে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব বা বাহাদুরী নেই, আছে বোকামী। তার থেকে ঐ সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ঘুমলে অন্ততঃ শরীরের উপকার হবে।

কিন্তু ঘুম আয় ব'ললে আসে না আর চিন্তা যা বললে যায় না। কৌতূহল মগজে সুড়সুড়ি দিতে থাকে তাই আদিত্য উঠে পড়ে তাদের অনুসরণ করাই স্থির করে।

অতি সাবধানে প্রায় নিঃশব্দে চলতে থাকে। ক্রমশঃ বীর-তালাও পেরিয়ে ছায়া মূর্তি বেদীর কাছে গেল। আদিত্য নিজেকে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কাল মূর্তি দুটি একজন লোককে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, একটু পরেই দেখল একটা লোক ছুটে বাড়ির দিকে পালিয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত আদিত্যের মনে হ'লো সন্ধ্যায় দেখা সেই আধ পাগল লোকটা। কি চায়? এ আবার কার চর।

চিন্তা হাত পা মেলার আগেই আদিত্য দেখল কাল মূর্তি দুটি পুরানো বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। অন্য কিছু ভাবার আগেই অতর্কিতে কেউ তার মুখ চেপে ধ'রল। সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যও হাত ছাড়াবার জন্যে নিজের হাত রাখল। অত অনিশ্চয়তার মধ্যেও সে অনুভব ক'রল আগের দিনে যে তার মুখ চেপে ধ'রেছিল, এ সে নয় কারণ এর হাতে আংটি থাকলেও ধরার কায়দা অন্যরকম। অদৃশ্য মানুষটি হিস হিস ক'রে

বলল—বেঘোরে প্রাণ দিয়ে কি ক'রবে? এতো মজা দেখা নয়, চিন্তার ব্যাপার। গুপ্তধন উদ্ধার হবে কি না, কিম্বা কে পাবে তা কেউ জানে না, শুধু মজা দেখতে গিয়ে প্রাণ দেবে কেন?

আদিত্য হাত ছাড়াবার চেষ্টা ক'রল পারল না। মৃদু হাসি শুনতে পেলো—এ হাত ছাড়াবার ক্ষমতা তোমার হবে না। তার থেকে চল তোমার ঘরে তোমাকে দিয়ে আসি। জানি তুমি আমার পরিচয় জানতে চাও। কিন্তু এখন নয়, সময়ে সব হবে। চল, পিছন ফিরে আমাকে দেখার চেষ্টা ক'রো না।

ঘরের কাছে আসতেই মূর্তি ব'লল—যাও, সোজা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। তাই ক'রল আদিত্য। বাধ্য ছেলের মত শুয়ে প'ড়ল। কিন্তু ঘুম আর এলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আদিত্য নানা কথা চিন্তা করতে লাগল। হঠাৎ কোন কিছুর ভাঙ্গার শব্দ কানে এলো। আশ্চর্য এত রাতে এটা কিসের আওয়াজ? অবশ্য সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তারপর সব নিঝুম।

এক সময় ভোরের উপর আগমন বার্তা ঘোষণা করল পাখিরা। আদিত্য আরও কিছুক্ষণ শুয়ে উঠে পড়ল।

যথা সময়ে চা নিয়ে চমনলাল হাজির হলো। ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে হাঁটু গেড়ে বসে প'ড়ল। তারপর সন্ধানী চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুর, আপনার কি রাতে ভাল ঘুম হয়নি?

কেন?

চোখ বসে গেছে। কি হল, হুজুর?

মশারির মধ্যে কয়েকটা মশা ছিল।

মশা ছিল? হুজুর, আপনি একথা যেন রাজাবাহাদুরকে বলবেন না, তাহলেই আমার চাকরি চলে যাবে। আপনি যে কত বড় মেহেমান, সে তো আমি···

তুমি চুপ কর, চমনলাল। তোমার রাজাবাহাদুরকে আমি কি এসব বাজে কথা বলতে যাব।···এখন বল তো, তোমার রাজাবাহাদুর

কখন যাবেন? তাঁর সঙ্গে কি যাবার আগে আমার দেখা হবে না?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমনলাল প্রায় এক হাত জিভ কেটে বললে, দেখেছেন তো হুজুর, বুড়ো হওয়ার দোষ—কোন কথা যদি মনে রাখতে পারি। রাজাবাহাদুর নাস্তা করেই বেরিয়ে যাবেন। তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। এই কথা আপনাকে জানাতে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি বেমালুম।

বিড়বিড় করতে করতে চমনলাল উঠে পড়ে।

আদিত্য হঠাৎ প্রশ্ন করে: আচ্ছা, কাল রাতে কিসের সোরগোল হচ্ছিল।

চলা পা'টাকে থামিয়ে দিয়ে চমনলাল একটু মজা করে বলে: হুজুর, এ দেহাতি জায়গা, এখানে এমন গণ্ডগোল নিত্য লেগে থাকে। আজ কে কার গরু চুরি করেছে, কে বা ঘোড়ার দড়ি খুলে দিচ্ছে—এই আর কি!

যাক, আমি ভাবলাম, না জানি কি!

আচ্ছা হুজুর, এখন আসি।

চমনলাল ঘর থেকে বেরোবার আগেই ঘরে এলেন বীরেন্দ্র সিং। বললেন, সুপ্রভাত আদিত্যবাবু, তোমার সেবা-যত্নে ত্রুটি তো কিছু হচ্ছে না? যদি কোন কিছু দরকার হয় চেয়ে নেবে, লজ্জা করবে না।

আর কিছু চাইবার দরকার হচ্ছে কোথায়? চমনলাল এত যত্ন করছে যে আমি বেশ লজ্জায় পড়ে যাচ্ছি।

সেকি কথা, যত্ন করবে না? আচ্ছা, চমন, তুমি এবার যাও।

ভৃত্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বীরেন্দ্র বলেন: দেখ, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি ঘুরে আসব। এই বিয়েতে আমার যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই। কিন্তু এমন অবস্থা না গেলেও চলবে না।

কেন চলবে না। যদি বলেন, আপনার শরীর ভাল লাগছে না বা ওই ধরনের কিছু।

যে কোন অজুহাতে যাওয়া নাকচ করা যেত, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার বিয়ের থেকে একটা অপ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। না গেলে সেটা আরো বাড়বে।

বিয়ের ব্যাপারে অশান্তি ?···অবশ্য এটা নেহাৎই ব্যক্তিগত কথা।

না, না, তাতে আর কি হয়েছে। আমার জ্ঞাতিভাই ছত্তর পাল আমার বিয়েতে এমন ভাঙচি দিল যে টিকমগড়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হল না। আমার বিয়ে হল ঝাঁসিতে। পরে অবশ্য ওরা বুঝেছিল সব ভুল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকে ওদের কোন কাজে নিমন্ত্রণ করলে যেতেই হয়, নাহলে ওরা ভাবে আমার বোধ হয় রাগ হয়েছে। যাক, কাল রাত্রে কিছু হয়নি তো।

আদিত্য বলল, কাল রাত্রে আমার কিছু হয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্য কিছু হয়েছে।

গতকাল বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে, আনুপূর্বিক সব বলে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে এগিয়ে দেয় বীরেন্দ্র সিংয়ের হাতে।

আদিত্য দেখল, চিঠি পড়তে পড়তে চিন্তার বলিরেখা বীরেন্দ্রর কপালে একের পর এক জমা হচ্ছে।

পড়া শেষ হলে চিঠিটা নাকের কাছে ধরলেন।

আদিত্য বুঝল, উনিও একটা গন্ধ পেয়েছেন। তবু জিজ্ঞেস করল কী হল ?

একটা যেন জানা জানা গন্ধ।

ঠিক বলেছেন, আমিও এই গন্ধটা পেয়েছি। কিন্তু এর আগে যে কোথায়, কোন ফুলে পেয়েছিলাম, তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বীরেন্দ্র একটু যেন অধৈর্য হয়ে বললেন, গন্ধের কথা থাক, এখন তোমার জন্যেই আমার ভীষণ চিন্তা হয়েছে। আমি থাকব না যদি বিপদআপদ কিছু হয়···অবশ্য জয়পাল রইল। ওকে তোমার সঙ্গী করে নিতে পার।

তা পারি। কিন্তু আপনি না ফেরা পর্যন্ত তো কিছুই হবে না।

সেকথা ঠিক ; তবে যদি কিছু দরকার হয়, ওকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আর একটা কথা, তোমার এই বারবাড়িতে থাকাটা খুব সেফ নয়। আমি চমনকে বলছি, ও যেন ভেতর বাড়ির ঘরে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।

আমার মনে হয় না তার কিছু দরকার হবে।

দেখ আদিত্য, তুমি বয়সে অনেক ছোট তাই সব সময় সব কিছুর গুরুত্ব দাও না। সাবধানের বিনাশ নেই। এই তো সেবার উড়ো খবর এল, আমার টায়ারের গুদামে আগুন লাগান হবে। আমি তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দিলাম। অবশ্য কিছু হয় নি। তা না হোক ; জেনে যদি কিছু না করতাম, তো আপশোষ হত।

আপনার টায়ারের কারখানা আছে ?

আরে না, না, টায়ারের এজেন্সী নিয়েছি।

কথা বলতে বলতেই উঠে পড়লেন বীরেন্দ্র ঃ তাহলে আমি চমনকে বলে যাচ্ছি, তোমার ঘর বদলে দিতে। চলি, কেমন ? সাবধানে···

মাপ করবেন, কথার মধ্যে কথা বলছি। আচ্ছা, সেই সব নথিপত্র গুলো ভাল জায়গায় আছে তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব সিন্দুকে তুলে রেখে গেছি। সাবধানে থেকো।

বীরেন্দ্রকে মুখে সাহস দেখালেও মনে মনে আদিত্য বেশ ভয়ই পেয়েছে। এক একবার ইচ্ছা হচ্ছে, এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু এই ভয়ের মধ্যেই কেমন একটা নেশা যেন ওকে পেয়ে বসেছে। গুপ্তধন বইপত্রে পড়েছে, সেই গুপ্তধন হাতে আসবে, আর তাকে উদ্ধার না করে চলে গেলে কি শান্তি পাওয়া যাবে !

চমনলাল অন্দরমহলের একটি ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে আদিত্যকে ডেকে নিয়ে এল। এই ঘরটা পুরোনো মহল আর অন্দর মহলের সীমানায়। বিপরীত দিকের দরজা খুললেই বীর সিংয়ের মহলটা

চোখে পড়ে। এই ঘরে একটা জানালাও রয়েছে ওই দিকে, যেটা খুললেও ওই মহলটা দেখা যাবে। আদিত্য জানলাটা খুলতে গিয়ে দেখল, সেটা খোলা অসম্ভব। বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেল, জানলাটা কেন খুলছে না দেখার জন্যে। একটু অবাক হল এই দেখে যে, ওই জানলাটা কাঠের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। পেরেকগুলো পরীক্ষা করলে মনে হয়, একেবারে নতুন। তার মানে ষড়যন্ত্রকারীরা জেনে ফেলেছে যে, আদিত্য ঘর পাল্টাচ্ছে।

কথাটা মনে হতেই হাসি পেল। এ কথা না জানতে পারার আছেই বা কি? ঘরের শত্রু বিভীষণ। বাইরের লোক তো নয় যে জানবে না।

ঘরে চেয়ারে বসে সেদিনের পত্রিকাটা টেনে পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই মন লাগছিল না। এমন সময় শুনল : আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরিয়ে আগন্তুককে দেখে বলে, আসুন, আসুন।

মুখে আপ্যায়ন করলেও, মনে একটা কালো চিন্তার ছায়া দুলতে থাকে। ভাবে, হরবংশের আগমনের হেতুই বা কি?

মনের চিন্তা মুখে আসতে দেয় না। প্রসন্নতার প্রলেপ মাখিয়ে বলে, তারপর, কি খবর? মিস্টার সিং চলে যাওয়াতে নিশ্চয় সব দায়িত্বই আপনার ওপর পড়েছে।

সেকথা বলতে পারেন। উনি বাইরে গেলে আমি একটু দিশেহারা হয়ে পড়ি। এক দিকে তাঁর বাড়িঘর, অন্য দিকে ব্যবসা—কোন্ দিকে যে নজর রাখব, বুঝতে পারি না।

মিস্টার জয়পালও তো রয়েছেন, উনিও নিশ্চয় আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

কথাটা বলার সময় আদিত্য দেখছিল, হরবংশের মুখের ভাব কি হয়।

ওর অনুমান মিথ্যা নয়, একটা যেন প্রতিহিংসার ছায়া মুখের ওপর

দিয়ে ভেসে গেল। কপালে দু-একটা বিরক্তির রেখা, চোয়ালে একটি কঠোরতার ছোঁয়া লেগে রইল। কিন্তু সহজ গলায় উত্তর দিল : কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বলা উচিত নয়, তবু বলছি। রাজাবাহাদুর তাঁর সম্বন্ধীকে ভীষণ স্নেহ করেন, কিন্তু সে কি তাঁর বিশ্বাস রাখে ?

এ কথায় আদিত্য একটু চমকে যায়। তবে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, কেন, কখনো কিছু করেছে নাকি ?

দেখুন স্যার, আপনি নতুন লোক। ঘরের কথা বলা উচিত নয়··· তবে ও-ছেলে বিশেষ সুবিধের নয়। রাজাজী বলেন বটে ফিলোজফার, আসলে কিন্তু ওর অনেক বাজে অভ্যাস আছে। যাক, ওসব কথা। যাঁদের বাড়ির ব্যাপার, তাঁরাই বুঝবেন।

কথার রেশ ধরেই আদিত্য বলে, বাজে অভ্যাস তো অমনি হয় না, টাকার দরকার। নিশ্চয় ওরা খুব বড়লোক।

রাজা তো ওঁরাও ছিলেন ; কিন্তু রানীমার বাবাও নানা ভাবে টাকা নষ্ট করে এখন তো দেউলিয়া। ছেলে এ-পক্ষের। রানীমার সৎভাই —কিন্তু খুবই ভালবাসেন ; ভাইয়ের টাকা তিনিই যোগান। আর নিজের যা ছিল, সবই তো এক এক করে যাচ্ছে। হাতের অমন আংটিটা সেদিনও ছিল, অথচ কাল দেখি, নেই। আমার কি !··· আচ্ছা, উঠি।

আংটির কথা বলতেই, হরবংশের হাতের আংটির দিকে অবাধ্য চোখ চলে যায়।

হরবংশ বোধ হয় বুঝতে পারে, তাড়াতাড়ি বলে, আমার আংটিটা দেখে একটু অবাক লাগছে তো ? এটা এক তিব্বতী সাধু দিয়েছিলেন। রক্তমুখী নীলা। এর অনেক দাম, কিন্তু সাধুবাবা একটি পয়সাও নেন নি। বলেছিল, দেখিস, এ তোকে কোথায় নিয়ে যাবে। তবে তাড়া-হুড়ো করিস নি···অসৎ পথে যাস নি।···আচ্ছা, চলি। আপনার কোন সুবিধা-অসুবিধা হলে বলবেন।



নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আপনাদের চমনলাল যা রয়েছে না··· অসুবিধা হবার যো-ই বা কোথায়!

হাসি মুখে হরবংশ বিদায় নেয়।

আদিত্যর মুখেও হাসি দেখা যায়। মনে মনে বলে, খুব ধূর্ত!

মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম করার অজুহাতে আদিত্য দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে দরজায় ফুটো করে। লোকচক্ষে যাতে ধরা না পড়ে, তাই কাগজের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে রাখল।

যথারীতি বিকেলে চমনলাল চা নিয়ে হাজির হল। অভ্যাস মত বসল। নানা কথা, দেশে কে আছে; এখান থেকে দেশ কত দূর··· ইত্যাদি। তারপর বলল, হুজুর, আপনারা তো সব লেখাপড়া জানা লোক, কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, ওই পুরোনো মহলে অনেক অপদেবতা আছে। একবার তো একদল ডাকাত এসেছিল, তারা পিছনের মহলে উঠে দরজা ভেঙে কি সব নিয়ে বেরোচ্ছিল। এমন সময় দেখে, বিশাল তলোয়ার হাতে নিয়ে এক সন্ন্যাসী। বলে, সব রেখে দে, নাহলে একজনকেও জ্যান্ত রাখব না।··· তাদের সর্দার বলেছিল, আমি সাধু-ফাধু মানি না। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে এক কোপ। বলে, তোদের এত সাহস যে দেবীমূর্তি নিয়ে যাচ্ছিস? রাখ!···ডাকাতের সর্দাররা সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

এই বললে, অপদেবতা আছে। আর এখন বলছ যে সন্ন্যাসী?

ও তো সন্ন্যাসীর বেশ ধরেছিল। আসলে তো সে ছিল।

কথাটা শেষ না করে মাথায় হাত ঠেকায়।

আদিত্য কৌতুকবশে বলে, তিনি যে অপদেবতা ছিলেন, তারও তো প্রমাণ নেই।

চোখ উজ্জ্বল করে চমনলাল বলে, ডাকাতরা পরের দিন এসে নিজেরাই বলল, শাস্তি চাইল। কিন্তু কোথায় সন্ন্যাসী? কত খোঁজা হল, কোথাও পাওয়া গেল না।

কতদিন আগে হয়েছিল ?

তা দশ-বিশ সাল আগে হবে।

এবার আদিত্য জোরে হেসে ওঠে। বলে, চমন, দশ আর বিশ কি খুব কাছাকাছি ?

চমন বেশ ক্ষুণ্ণ হয় আদিত্যের উপহাসের ভাব দেখে। বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, এই তো, আপনি বিশ্বাস করেন নি !

আদিত্য তাড়াতাড়ি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে, কে বলেছে, বিশ্বাস করি নি ! নিশ্চয় বিশ্বাস করেছি। দেখ, কি রকম সাবধানে থাকব।

চমনের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে, হ্যাঁ, হুজুর, খুব সাবধানে থাকবেন। যত রাতই হোক, দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন। ওই বেলটা বাজালেই আমি এসে যাব। সব থেকে ভাল, আমি আপনার ঘরে শোব।

আরে, না, না, তুমি পাগল হলে নাকি ! আমি কি ছোট ছেলে ?

না, তা নয়। বিদেশে এসেছেন যাতে কোন বিপদ না হয়, তা তো আমাদেরই দেখতে হবে। যতক্ষণ না রাজাবাহাদুর আসছেন, ততক্ষণ আমারই দায়িত্ব।

চমনলালের কথা শুনতে আদিত্যর খুব ভাল লাগে। কেমন একটা আত্মীয় ভাব।

এখন যাচ্ছি হুজুর। আজ কি কোথাও যাবেন ?

আজ আর কোথাও যাব না, নিচে বাগানে বেড়াব।

সেই ভাল, সেই ভাল।

যেতে যেতে হঠাৎ থেমে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার এক বন্ধুকে দিয়ে মাছ রান্না করিয়েছি। দেখবেন কেমন স্বাদ তার !

আর দাঁড়ায় না।

আদিত্যের মনটা খুশিতে ভরে গেল। দূর দেশেও স্নেহের স্পর্শ বড় ভাল লাগল।

একটু পরে নিচে নেমে এল। বাগানে পায়চারী করতে করতে এক অমোঘ টানে সেই বেদীটার কাছে গিয়েই দেখল, একজন লোক লাল বেদীটাতে কি যেন করছে। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলল, এই, তুমি কে ?

সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের আধ-পাগল লোকটা উঠে দাঁড়াল। এক মূহূর্ত আদিত্যের দিকে তাকিয়ে থেকে পা টেনে টেনে চলতে আরম্ভ করল।

দাঁড়াও !

গম্ভীর অথচ জোরে, অনেকটা হুকুমের ভঙ্গিতে বলল আদিত্য।

লোকটা চমকে থেমে গেল।

এদিকে এসো।

একটু সময় অপেক্ষা করে ফিরে দাঁড়াল আধ-পাগলা লোকটা।

কি করছিলে ওখানে ?

কোন উত্তর নেই।

আবার ধমক দিল ঃ কি হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন ? বল নাহলে মার খাবে।

খনা স্বরে কি যেন বলতে চেষ্টা করল, আদিত্য কিছু বুঝতে পারল না। বলল, দেখি, তোমার হাত।

সে হাত দেখাল। একটা জমি-খোঁড়া খুরপি ছাড়া হাতে কিছু নেই।

ঠিক আছে, যাও।

আদিত্য মনে মনে বলল, এখন তো হাতে কিছু নেই, কিন্তু আগে যদি কিছু সরিয়ে থাকো বা পরে সরায়···চমনলালকে বলতে হবে ওর ওপর নজর রাখতে। এ লোকটা যে সুবিধার নয় এর দৃষ্টিতেই তা বোঝা যায়।

ঝুঁকে পড়ে পাথরটাকে পরীক্ষা করল আদিত্য। বেশ বোঝা যাচ্ছে কেউ এটা সরিয়েছে। তার একার পক্ষে এ পাথর সরানো

অসম্ভব। তাছাড়া তার এই পাথরে এত আগ্রহ দেখলে অন্য সকলের মনেও সন্দেহ জাগবে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়েই কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরল তারপর নিজের ঘরে ফিরে এল।

কোন কিছুতেই মন বসাতে পারল না। বীরেন্দ্রের কি ঠিক এই সময়েই যেতে হয় আশ্চর্য! নৌকো বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তীরে তুলতে পারবে না।

চিন্তার পথ বেয়ে হাঁটায় বাধা পড়ল। পাচক সহ চমনলাল এল। রহিসি কায়দায় টেবিল সাজিয়ে দিল। খাদ্যবস্তু যা দিয়েছে, তাতে আদিত্যের মত চারজন লোক খেতে পারে। শুধু খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্যই নয়, রান্নার আঘ্রাণ তার মনের ভার লাঘব করে রসনাকে সরস করে তোলে।

সুগৃহিনীর মত সামনে বসে ওটা খান ইত্যাদি বলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে চলল তার গল্পের মিছিল। কিভাবে লোক দিয়ে মাছ ধরিয়েছে। এখানে মাছ ধরা নিষেধ। পণ্ডিতরা যদি জানতে পারে সে এ-বাড়িতে মাছ ঢুকিয়েছে, তাহলেই তার শাস্তি হবে। তবে সে এমন গোপনে করেছে যে মানুষ কেন, কাক-পক্ষীও টের পায় নি। সে কথাও জানাল।

চমনের কথার মাঝে একবারও যতি পড়ে না, তাই আদিত্যও কিছু বলার সুযোগ পায় না। বহুক্ষণ বাদে করুণা করে সে আদিত্যকে কিছু বলার অবকাশ দিল।

আচ্ছা চমন, তোমাদের যে লোকটি গোয়ালে কাজ করে সে কেমন?

কেমন মানে? লোক কেমন, না দেখতে কেমন?

লোক কেমন?

ভালই তো মনে হয়। কথা-টথা বলতে পারে না, হাবা। কেন বলুন তো?

না, ওকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়, একটু নজর রেখো। আর হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছি, তা যেন নায়েবমশাইকে কিম্বা আর কাউকে বোলো না—একটু চুপ করে থেকে আদিত্য আবার প্রশ্ন করে, চমন, তোমাদের রাণীমার ভাই জয়পালজী কেমন মানুষ, ভাল ?

হুজুর কি বলব, মামাবাহাদুর তো মানুষ নয়, দেবতা—সাক্ষাৎ দেবতা। গরীবদের দেখা-শোনা করেন। কোথায় কোন গরীবের ছেলে পড়তে পারছে না, কোন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না—এই সব। তবে একটা দোষও আছে, মাঝে-মাঝে উদাস হয়ে যান। পৃথিবীর কোন জিনিস ওঁর ভাল লাগে না। কেন হুজুর, এ কথা জানতে চাইছেন ?

না, এমনিই। আমার ওঁকে খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আজ তো সারাদিন দেখতে পেলাম না। বীরেন্দ্রজী যে বলেছিলেন, কোন কিছু দরকার হলে তাঁকে বলতে। তাই···

উনি আজ সকালে গ্রামে গেছেন, একটা স্কুলে কি হবে, তাই। কালই বোধ হয় আসবেন।···এবার আমি যাই, আপনি ভেতর থেকে বেশ ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দেবেন, কেউ ডাকলেও রাতে দরজা খুলবেন না।···আচ্ছা, আসি।

চমন চলে যেতে দরজা ভাল করে বন্ধ করে। অন্যান্য জানলাগুলো পরীক্ষা করে একটা চেয়ার সেই জানলার কাছে এনে রাখল, যেখানে ও ফুটো করে রেখেছিল।

সব ঠিকঠাক করে বেড ল্যাম্পটা জ্বেলে গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। আদিত্য জানে, বাড়ি নিস্তব্ধ না হলে অন্ধকারের মানুষদের যাতায়াত শুরু হবে না।

জেগে থাকবে মনে করেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না। ফিস-ফিস কথার আওয়াজে তন্দ্রা ভেঙে গেল। হাতঘড়িতে দেখল, রাত একটা। তাড়াতাড়ি টর্চটা হাতে নিয়ে বেড-সুইচটা নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে বসল। টর্চের আলো ফেলে গর্তের মুখের কাগজটা সরিয়ে দিল। তারপর বাইরে দেখতে চেষ্টা করল। প্রথম কিছুই চোখে

পড়ল না। অন্ধকারের দিকে তাকালে মনে হয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, খানিকক্ষণ দেখতে দেখতে সব কিছুই দেখা যায়।

চাঁদের আলোও পড়েছে। নতুন এবং পুরোনো বাড়ির মাঝের ব্রীজে দুটি কালো মূর্তি। এই দুটিকেই যেন গতকাল রাত্রে দেখেছে। তারাই বোধ হয় একটু আগে ঘরের সামনে দিয়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আদিত্য তাকিয়ে থাকে। ওই বাড়ি-ঘরের দরজা-গুলি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ ধাতুর দরজাটি চকচক করার জন্যে বেশি বোঝা যাচ্ছিল।

ছায়ামূর্তি দুটি ওই দরজার সামনে গিয়ে থামল। কৌতূহলে আদিত্যের শরীর শিরশির করছিল। হঠাৎ দেখল, দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, আর ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। একটু পরে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আদিত্যর পক্ষে বসে থাকা আর সম্ভব হল না। সন্তর্পণে দরজা খুলে এগিয়ে গেল পুরোনো বাড়ির দিকে। নির্দিষ্ট দরজার কাছে এসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল কি হচ্ছে। মনে হল, ধাতব কোন জিনিসে কেউ হাতুড়ি মারছে। একবার থামছে, আবার শুরু করছে।

বেশিক্ষণ এখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকার যে কোন অর্থই হয় না, সে তা জানে। সে দ্রুত পা চালিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। আবার জানলায় বসল। বহুক্ষণ বাদে তিনটি মূর্তি ঘর থেকে বেরোল।

আদিত্যর সামনে দিয়েই গেল, কিন্তু তাদের কাউকেই সে চিনতে পারল না। মনে হল, কালো তিনটি ছায়া।

আধো ঘুম আধো জাগায় বাকি রাত কেটে গেল। বিছানায় থাকতে আজ আদিত্যর ভাল লাগল না। মনের মধ্যে এক বিশ্রী রকম অস্বস্তি। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দায় বেরিয়ে ঘুরতে লাগল। বাড়ির মধ্যেকার সেতুটায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি চালাতে গিয়ে দেখল, বীর তালাওয়ের একটা অংশ চোখে পড়ে। সেখানে একটা ছোট জটলা মত। জন চার-পাঁচ লোক বেশ উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলাবলি করছে। এর মধ্যে পরিচিত লোক তিনজন—দেউড়ির রামদয়াল পাণ্ডে, চমন আর পাচকটি। আর বাকি যারা, তারাও ওই শ্রেণীর। হাত কয়েক দূরে একটি মহিলা, সম্ভবত এ বাড়ির দাসীই হবে।

আদিত্যর মনে হল কাল রাতে যারা ঘোরাফেরা করেছে, তাদের নিয়েই বোধ হয় বাক-বিতণ্ডা চলেছে। ব্যাপার যাই হোক, আজ চা পেতে যে দেরি হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেতু পেরিয়ে পুরোনো বাড়িতে গেল। হঠাৎ মনে হল, ধুলো-পড়া মেঝেতে পায়ের ছাপ আবিষ্কার করার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ফেলে এগোতে লাগল। যতগুলো ছাপ দেখল সব-গুলোই রবার সোলের। বোঝা গেল, যারা এসেছিল, তারা সাধারণ চোর নয়। বেশ শিক্ষিত ষড়যন্ত্রকারী।

আদিত্য ঘরের দিকে ফিরতে লাগল। সেতুর ওপর এসে নিচের দিকে তাকাল। না, জটলা নেই। তবে এবার চা আসবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চমন এসে গেল। কৈফিয়তের সুরে বলল, হুজুর, আজ যা কাণ্ড হয়েছে!

হ্যাঁ, তাই দেখলাম…

আদিত্যর কথা শেষ করতে না দিয়ে অবাক বিস্ময়ে চমন বলে, আপনি দেখেছেন। কি করে দেখলেন ?

কেন, বারান্দা থেকে।

ওর চোখে মুখে একটা ভয়ার্ত ভাব ফুটে ওঠে। বলে, আপনি সেই রাত্রে বেরিয়েছিলেন, একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

রাত্রে বেরোব কেন, এখনই তো ঘুরছিলাম। দেখলাম তোমরা সব একজোট হয়ে কি সব বলছ। তাই বুঝলাম যে···

বাবাঃ, বাঁচালেন।

ও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে আরম্ভ করল ঃ কাল রাতে যা কাণ্ড হয়েছে, আর কি বলব !

আদিত্য রাতের কথা চেপে গিয়ে বলল, কেন, কি হল আবার ?

ওই যে গোয়ালের লোকটা, যার কথা আপনি কাল জিজ্ঞেস করছিলেন তাকে না···

কথাটা শেষ না করেই ছু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, নাগ দেবতায় কেটেছে। আপনাকে বলেছি না, আলো না নিয়ে হাঁটবেন না। দেখুন তো, কি বিপদ।

এই লোকটির মৃত্যুর খবর শুনে আদিত্যর বিচিত্র এক অনুভূতি হল। লোকটাকে অদ্ভুত লেগেছিল তার কিন্তু এভাবে হঠাৎ মৃত্যু মোটেই কাম্য নয়। ওর সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যাচাই করে তো দেখা হয় নি, হয়তো সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা।

কি ভাবছেন ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে বোধ হয় চমনের আশ্চর্যই লেগেছে। আদিত্যও অপ্রস্তুত হয়ে বলে, না, ভাবছিলাম। মানুষের জীবন কত অস্থায়ী, তাই না ?

ঠিক বলেছেন হুজুর। আমিও এক এক সময় ভাবি, এই তো বুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবন, তাতেও আমরা কেন এত লোভ করি।

চমন দার্শনিক হয়ে উঠছে দেখে আদিত্য অন্য কথা পাড়ে: জয়পালজী আসছে নাকি?

উদাস ভাবেই চমন বলে, আশা তো করি।

আদিত্য অন্য কথা পাড়ার চেষ্টা করে, মাছ কে রান্না করেছিল?

আমার এক বন্ধু, সে অনেক দিন বাংলা দেশে ছিল। অনেক রকম মাছ রান্না করতে পারে।···আচ্ছা হুজুর, এখন যাচ্ছি।

চমনলাল চলে যাবার পর আদিত্যর মনে হয়, এ মৃত্যুটা যেন স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কি করে যে এটা বোঝা যাবে, সে কথাও বুঝতে পারে না।

দেখতে দেখতে অলস দ্বিপ্রহরের পর বিকাল আসে। বেশ দেরিতেই চমন এল। বলে, আর বলবেন না, এক ঝামেলা এসেছে।

তার মানে?

কোথা থেকে এক হাজী মহম্মদ এসেছে। বলে, রাজাবাহাদুরের নাকি বন্ধু। এ বাড়িতে থাকতে চায়। নায়েবসাহেব বললেন, যাঁর বন্ধু, তিনি এলে, আপনি থাকবেন। কিন্তু সে কিছুতেই শুনবে না, শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরেই উঠেছে।

চা খেতে খেতে আদিত্য বলে, চল চমন, তোমার হাজীসাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

আদিত্যর পরিত্যক্ত ঘরে উঠেছেন হাজীসাহেব। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চমনকে দিয়ে খবর পাঠায় আদিত্য।

সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল তুলে বেরিয়ে আসেন তিনি: আসুন, আসুন, আমার কি সৌভাগ্য! আপনার মত লোক, নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আপনার সৌভাগ্য কিসে? আমারই সৌভাগ্য যে, আপনার মত খানদানী লোকের সঙ্গে দেখা হল।

আদিত্য একটু অবাকই হয়েছিল তাঁর আন্তরিক কথায়। কারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে ঠিক এভাবে আপ্যায়ন করা একটু যেন

বাড়াবাড়ি মনে হল। নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে বলল, আপনি তো আমাকে চেনেন না? কি করে জানলেন, আমার সঙ্গে দেখা হওয়া সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার পরিচয় আমি সব পেয়েছি চমনলালের কাছে। আপনি নাকি কি এক বিশেষ দরকারে এখানে এসেছেন।

কথাটা বলেই চশমার মধ্যে দিয়ে আদিত্যর দিকে হাজী সাহেব ক্ষণেকের জন্যে কেমন ভাবে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে কৌতূহল, ব্যঙ্গ না অনুসন্ধিৎসা কি ছিল তা বোঝা গেল না।

ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে খানদানী ভাব রয়েছে। সুপুরুষ। বয়স বোঝা কঠিন। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ, যে কোন একটা হতে পারে।

আদিত্য একটু সময়ের জন্যে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। তার মধ্যেই হাজীসাহেবের তাগিদ এল। কি ভাবছেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উত্তর দেয়ঃ কি জানি, চমন আমার সম্বন্ধে কি নিন্দে-বান্দা করল।

নিন্দে-বান্দা করবে কি? এত প্রশংসা করেছে যে বলার নয়, আর সময়ই বা পেল কতটুকুন?···আরে, আপনি কি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? ভেতরে আসুন।

দুজনেই ঘরে ঢোকে। চলনলালও সঙ্গে আসে।

সোফা দেখিয়ে হাজীসাহেব বলেন, বসুন।

তারপর চমনের দিকে তাকিয়ে বলে, একটু চা খেলে বড় ভাল হত।

আদিত্যর কেমন সঙ্কোচ লাগে, পরের বাড়ির অতিথি হয়ে আবার ফরমাস করা।

হাজীসাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেশ সহজভাবে বসে বললেন, আরে, আপনার পুরো নামটাই জানা হয় নি।

আমার নাম আদিত্য রায়।

ব্রাহ্মণ নাকি? রায় অবশ্য সব জাতে, সব প্রদেশেই প্রায় ব্যবহার হয়।

হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণ।

মুসলমানের সঙ্গে চা খেতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো।

না, না, আপত্তির কি আছে? এসব তো মানুষের নিজের গড়া ভেদ-নীতি। আমি ওসব মানি না। আমার মনে হয়, বুদ্ধিমান কোন মানুষই···

আরে, ওসব কথা ছাড়ুন। এদিকে এসেছেন কি দেশ দেখতে, মানে খাজুরাহো দেখার জন্যে?

না, ঠিক তা নয়।

সেটা অবশ্য ঠিক, খাজুরাহোতে এসে ওর্ছায় আসবেন কেন? তার মানে, অন্য কাজ!

কথাটা আদিত্যের কানে বিশেষ ভাল লাগল না। বলল, অন্য কাজ আর কি, বীরেন্দ্র সিংজীর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

ভাল, ভাল, আমারও তাই। শুনছি, তিনি নাকি দিন চারেক পরে আসবেন।

নিজের মনেই তারপর বিড়বিড় করে বলে, অত দিন কি অপেক্ষা করা যাবে?

চিন্তিত ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকেন। সেই সময়ে আদিত্যর চোখে পড়ে, বিরাট একটা নবরত্নের আংটি। সঙ্গে সঙ্গে হরবংশের আংটিটার কথাও মনে পড়ে যায়।

নীরবতা ভঙ্গ করার জন্যেই আদিত্য বলে: হাজীসাহেব, আপনার হাতের আংটিটা তো অদ্ভুত দেখতে, আর কত বড়।

কথাটা কানে যেতে হাজীসাহেব বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠে বলেন, হ্যাঁ, এই রকম দুটো আংটি মা করিয়েছিলেন। একটা হীরের আর একটা এই। বড় ছেলেকে হীরেরটা দিয়েছেন, আর আমাকে এইটা।

এগুলো এত বড় কেন জানেন, আসলে এটা একটা বিষের কৌটো !··· কি, চমকে গেলেন ? এই দেখুন, ওপরটা টানলেই ডালা খুলে যাবে, আর বিষের বড়ি মুখে দিয়ে দেবেন। ভয় নেই, এই দেখুন, এটা শূন্য। আমি আর বিষ রেখে কি করব ?

দুজনেই আবার চিন্তার মধ্যে ডুব দেয় ! ঠিক তখন চমন আসে। হাজীসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, খাঁসাহেব, আপনি রাত্রে কি খাবেন ?

তুমি যা খাওয়াবে, তাই খাব। কোন চিন্তা কোরো না, গোস্ত না হলেও কিছু না। আমি জানি, এ বাড়িতে ওসব হয় না।

একটু পরে আদিত্য উঠে পড়ল : আবার দেখা হবে, এক জায়গায় যখন আছি ! আজ চলি।

আচ্ছা, কিন্তু এত তাড়া কিসের ?

এমনিই, কিছু না। বড় রাস্তায় একটু ঘুরে আসি।

আজ নদীর পথে না গিয়ে বিপরীত দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়। একটি রাম-সীতার মন্দির দেখতে পায়। চাতালে বসে। দূরে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর খুব ভাল লাগে পাহাড় দেখতে। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আদিত্য তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শুনল, সাহেব!

চমক ভাঙল। তাকিয়ে দেখল, আগের দিনের পত্রবাহক সেই ছেলেটি। ওকে দেখে আদিত্যর বেশ কৌতূহল হয়। বলে, কি, চিঠি আছে নাকি?

সেও কৌতুক করার মত চোখ করে বলে, আছে তো; আগে টাকা দাও।

আদিত্য চমকে যায়, আবার চিঠি! কিছু না বলে একটা টাকা বার করে এগিয়ে দেয়। ছেলেটিও কলের পুতুলের মত চিঠিটা বাড়িয়ে ধরে। টাকাটা নিয়েই ছেলেটি এক ছুটে চলে যায়। চিঠিটি খোলার আগে গন্ধ পরীক্ষা করার জন্যে নাকের কাছে ধরে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই, আগের দিনের সেই মৃদু গন্ধ।

চিঠি খোলার আগেই বুঝতে পারল, এর কথা কি হতে পারে। কারণ পত্রলেখক এক রাত সময় দিয়েছিল। কিন্তু দু-রাত কেটে গেছে, উত্তর পায় নি। কাজেই আজ যা হোক একটা কিছু ফয়সালা করতে চায়। দেখা যাক, বায়নাটা কি:

আগের চিঠিতে তোমার কাছে গুপ্তভাণ্ডারে যাবার পথ জানতে চেয়েছিলাম। এখন আর তা জানার দরকার নেই, শুধু বীর তালাওয়ের পথের চাবিটা দিয়ে দাও। খুব বিশ্বাসী লোক রেখেছিল —প্রাণ দিল, কিন্তু চাবি কোথায় বলল না। হাবাবোবা সেজে থাকত।

মারের চোটে কথা ফুটল, কিন্তু চাবি কোথায় সে কথা বলাতে পারলাম না। সত্যি, এরা আদর্শবাদী ! যাক সে কথা, চাবি যদি কাল সন্ধ্যার মধ্যে না পাই, তবে তোমারও ওই গতি হবে। আজ রাতে দিলেই সব থেকে ভাল হয়।

ভয়ের থেকে আদিত্যের মজাই লাগল। এ তো দেখছি, চোরের ওপর বাটপাড়ি। আবার একটা দল কোথা থেকে এল ? ওই গোয়ালের চাকরটাকে তবে কে বহাল করল ? বীরেন্দ্র সিংহ নিজেই কি ? রহস্য ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। এ সময় জয়পাল থাকলে ভাল হত।

চমন খাবার নিয়ে এল। পাচকটিকে দেখলে, আদিত্যর ভীমের কথা মনে পড়ে যায়। একবার মামার বাড়ির গ্রামে যাত্রা দেখেছিল। তাতে যে ভীম হয়েছিল, তাকে দেখতে ঠিক এই রান্নার লোকটির মত। প্রতিদিন দু'বার আসে, কিন্তু মুখে একটি কথাও বলে না। যেন একটি যন্ত্র।

রান্নার লোকটি চলে যাবার পর আদিত্যই জিজ্ঞেস করল, চমন, জয়পালজী কবে ফিরবেন ? তাঁকে আমার বড় দরকার ছিল।

আর বলেন কেন হুজুর, মামাবাহাদুর এক মুশকিলে পড়ে আসতে পারছে না। আজই লোক এসে খবর দিল।

কি হল আবার ?

ওই তো বলেছি না, লোকের ভাল করার রোগ। যেখানে গেছে সেখানে নাকি সব লোকের কি অসুখ করছে, মামাবাহাদুর তারই দেহ ভাল করছে। ফিরতে ফিরতে কাল-পরশু হবে।

এখনও দুদিন !

আগের দিনের মতই আহারের পর দরজার ফুটোয় চোখ রেখে আদিত্য বসেছিল। গতকালের তুলনায় আজ একটু তাড়াতাড়িই মূর্তি দুটি ঘরে ঢুকল। কিন্তু অল্প পরেই তিনটি মূর্তি বেরিয়ে এল। তার মানে ঘরে সর্বদা একজন করে লোক থাকে।

আদিত্যর আজ বড় ক্লান্তি লাগছিল। সকালে সেই হাবা লোকটির মৃত্যুর পর থেকে হাজীসাহেবের আগমন, চিঠি, তিন মূর্তির আসা যাওয়া—পরপর এত ঘটনার চাপই এই ক্লান্তির কারণ।

বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে গেল।

রাত কত হবে আন্দাজ করতে পারল না, দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দে আদিত্য ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারে না ঘুমের ঘোরে। দরজায় আবার আওয়াজ হয়। এবার আদিত্য বেড সুইচটা জ্বালে।

দরজার ওধার থেকে চমনলালের ভয়ার্ত কণ্ঠ ভেসে আসে : হুজুর—হুজুর!

কে, চমনলাল?

হ্যাঁ, হুজুর, দরজা খুলুন।

আদিত্য দরজা খোলে। ঘরের আলোটা তার মুখে পড়তে দেখল, ভয়ে তার চোখ দুটি বসে গেছে। দেখে কষ্ট হয়। প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার চমন, তুমি এত রাতে এভাবে, কোন বিপদ হয় নি তো?

বিপদ বলে বিপদ! রাজাবাহাদুর নেই, মামাবাহাদুর নেই, রানীমা রয়েছে—দায়িত্ব তো আমারই হুজুর।

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু কি হল? চোর ঢুকেছে নাকি?

ডাকাত! চোর হলে তো রক্ষে ছিল, এ একেবারে বন্দুক হাতে ডাকাত!

কিছু নিয়ে গেছে নাকি?

নেবে আর কি হুজুর, তাকে তো দেখাই গেল।

এবার আদিত্য হেসে ফেলে বলে, তবে বোধ হয় তোমার সেই অপদেবতা। সে যাই হোক হল, কিন্তু তিনি যে এবার বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার প্রমাণ কি করে পেলে?

সে কথাই তো বলছি, হুজুর।

কথা বলতে বলতে চমন ঘরে ঢুকে এসে মেঝেতে বসে পড়ে। বলে, এখনও বুকের মধ্যে কেমন করছে হুজুর।

আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি একটু জিরিয়ে নাও। বুঝতে পেরেছি, তুমি খুবই ভয় পেয়েছ।

না, ভয় পাই নি, শুনুন না বলি। আমাদের কেবলপ্রসাদকে তো দেখেছেন? যে রান্না করে। সে খানিকটা আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিল, আমাদের তো এই রকম বাথরুম-টুম নেই। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যে কোথা থেকে গুলি করল···চেঁচামেচি হৈচৈ! কি ভাগ্যি যে, ওর পায়ের গোড়ালিতে লেগেছে।

এ তো সত্যিই চিন্তার বিষয়। তোমাদের নায়েবমশাইকে বলেছ?

বলব কি, উনি তো তখনই কোথা থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরেছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ উনিও পেয়ে ছুটে এসেছিলেন গ্যারেজ থেকে। আমরা সবাই চারধার খুঁজলাম, কিন্তু কোন হদিস পেলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চমনলাল বললে, গণ্ডগোল একটু কমতে আমার আপনার কথা মনে হল। কি জানি, আপনি আবার যদি আওয়াজ শুনে বেরিয়ে থাকেন, আর আনাচে কানাচে কেউ যদি কিছু···

কথাটা মাঝপথে থামিয়ে, হাত-জোড় করে কোন দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলল, ভগবানের দয়া যে, আপনার ঘুম ভাঙে নি।

চমনলালের এই আত্মীয়সুলভ উদ্বিগ্ন ভাবটা আদিত্যর ভীষণ ভাল লাগে। সেও সস্নেহে বলে, চমন, তুমি এক কাজ কর। আমার ঘরে ঘুমোও। রাতের তো আর বড় বাকি নেই।

তা কি কখনও হয়? আপনি ঘুমোন। আমি নিচে গিয়ে দেখি, কি হল।

আস্তে আস্তে চমনলাল বেরিয়ে যায়।

আদিত্য বুঝল ঘুমের আশা আর নেই। শুয়ে থাকতেও ইচ্ছা করল না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নতুন আর পুরানো বাড়ির মাঝের ঝুলান পুলটায় এসে দাঁড়াল সে। নতুন বাড়িটার দিকে তাকাতে দেখল একটা ঘরের জানালা খোলা। নীল আলো জ্বলছে। অনাবশ্যক ভাবেই সেদিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হলো হরবংশ!

আশ্চর্য! এই ভোর রাতে রানীর বসার ঘরে হরবংশ কেন? তবে কি সে রানীকে একা পেয়ে খুন করতে গেছে, কিম্বা ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে চায়? আদিত্য কিছু পারুক না পারুক অন্যায়ে বাধা তো দিতে পারবে।

সাবধানে এগিয়ে গিয়ে জানলার পাশে কান পাতল, হরবংশের কণ্ঠস্বর—রানীমা, আমি আপনাদের নুন খেয়েছি নেমকহারামি করব না।

—কিন্তু এটা কি রানীর কাছে এসে নথিপত্র চাইবার সময়?

—এটা যে অসময় তা আমারও জানা আছে কিন্তু কোন উপায় নেই বলেই এসেছি।

—আমি দেব না।

এবার হরবংশের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শোনায়—ভাল কথায় যদি না দেন তবে আমাকে অন্য রাস্তা দেখতে হবে রানীমা!

—তার মানে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনাকে ভয় দেখাবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। শুধু কাগজ···

—দেখুন নায়েবমশাই আমি অন্দরমহলে থাকলেও অনেক খবরই

রাখি। ছত্তরপালের সঙ্গে আপনার গোপন যোগাযোগ রাজাসাহেব না জানলে কি হবে, আমি জানি।

—যা জানেন তা ঠিক নয়।

রানীমার হাসি শোনা গেল। তারপর বললেন—আমি যা জানি সব ভুল আর আপনি যা জানেন সবই ঠিক।

—দেখুন রানীমা, কথা বাড়াতে আমি চাইছি না, কাগজটা দিলে ভাল করতেন। যদি না দেন তবে বাধ্য হয়ে রাজা সাহেবকে খবর দিতে হবে।

—আপনি যে সৎ অভিপ্রায়ে চাইছেন তার প্রমাণ কি ?

—প্রমাণ আমার কথা।

—ঠিক আছে দিচ্ছি। তার আগে বলুন ঐ দাড়িওয়ালা লোকটা কে আর রাজাবাহাত্নর যাবার পরই বা এসেছে কেন ?

—উনি রাজাবাহাত্নরের বন্ধু।

—কিন্তু এমন নামে তো আমি কোন বন্ধুর কথা শুনিনি।

—আপনি কি সকলকে চেনেন ? আর দেরী করবেন না, টায়ারের কাগজ পত্রগুলো দিয়ে দিন।

আদিত্য আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করল না, দ্রুত পায়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে চ'লে এলো।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে মনে হলো কে যেন বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কোথায় গুপ্তধন আর কোথায় টায়ারের কাগজপত্র। যত ঝামেলা !

অলস পায়ে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল, তার জামা-কাপড় কেউ খুলে বিছানার ওপর ছড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি দেখল কিছু খোয়া গেছে কি না।

সব ঠিক ঠাকই আছে, তবে ? কি চায় এরা ? হাসি পেলো, নিশ্চয় চাবি !

দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আদিত্য আজ আর চায়ের আশা না করে বেরিয়ে পড়ে। লাল মোরাম ঢালা পথ দিয়ে এগিয়ে যায়। দেউড়ির দরওয়ান তখন সবে ঘুম ভেঙ্গে উঠে নিমের দাঁতন চিবোচ্ছে। সে আর কথা বলল না। পা চালিয়ে দিল। এখনই হয়তো হাজি সাহেব বা হরবংশের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

চলতে চলতে আদিত্য ভাবল হরবংশ যখন টায়ারের কাগজ নিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ছত্তরপালকে দেবে। রামসীতার মন্দিরটার কাছাকাছি থাকলে ছত্তরপালের দেখা মিলতেও পারে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় এসে পড়ল রামসীতার মন্দিরের কাছে। তখনও দরজা বন্ধ। চাতালটার ওপর বসে বসে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে আদিত্য গাঁথার চেষ্টা করতে লাগল। কানে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। তবে কি ছত্তর আসছে! নাও হতে পারে। দেখা যাক।

একটু পরেই দেখা গেল বিশাল ঘোড়ার পিঠে সেই রাজপুরুষটি। কী রূপ। লোকটি আদিত্যকে দেখে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, তারপর টানা টানা কাল গভীর চোখে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল—আপনিই বাঙ্গালীবাবু? বীরেন্দ্রের মেহেমান?

কণ্ঠস্বর এবং বলার ধরনে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা তাকে আকৃষ্ট করল। সে সসম্ভ্রমে উঠে এগিয়ে এসে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম আদিত্য রায়। আমি বাঙ্গালীই বটে।

—আপনাকেই সেদিন বীরেন্দ্রের মহফিলে দেখেছিলাম, তাই না?

—ঠিকই ধরেছেন।

—বিশেষ কাজ ছিল ওর সঙ্গে, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাকে কি চেনেন?

ও যা অনুমান করেছে তা বলল না, ব'লল—

—আমি তো এখানে নতুন এসেছি, তাই কাউকে চিনি না। তবে আপনার দেহকান্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে আপনি রাজ পরিবারের কেউ।

উদার হাসিতে ভোরের বাতাস ভরিয়ে বলল—আপনি রূপচর্চা করেন, না জ্যোতিষ? ধরেছেন ঠিকই। আমি রাজ পরিবারের, আমার নাম ছত্তরপাল।

—আমি রূপ চর্চা করি না, নেহাতই গাছপালার চর্চা করি, বোটানির ছাত্র। আর আমার শখ ইতিহাস পড়া বা প্রাচীন ইতিহাস খোঁজা।

—আরে বাহ। তবে তো আপনার সঙ্গে আমারই মিল হবে, চলুন আমার বাড়ি।

—এখন? আমি যে ওদের কিছু বলে আসিনি।

আবার সেই মধুর হাসি।

—আরে আপনি কি বাচ্চা ছেলে যে লোকে ভাববে হারিয়ে যাবেন। চলুন।

—ঠিক আছে, কোন দিকে বাড়ি বলে দিন আমি হেঁটে হেঁটে চলে যাব।

—সে কী কথা, আমি যাব ঘোড়ায় আর মেহেমান যাবে হেঁটে। আসুন ঘোড়ার পিঠে।

আদিত্য লজ্জা পেয়ে বলে, আমি কিন্তু ঘোড়ায় চড়তে জানি না।

—আপনাকে কি ঘোড়া চালাতে বলছি? আপনি শুধু আমাকে ধরে বসে থাকবেন। ব্যাস।

বহু কষ্টে ঘোড়ায় উঠে বসল। ছত্তরপাল ধীরে ধীরেই ঘোড়া চালালেন। মিনিট পনেরো পরে তারা একটা রাজবাড়ির সামনে এসে পড়ল। বীরেন্দ্রের মত অত বড় বাড়ি না হলেও প্রাসাদ বলা চলে।

সুন্দর সাজান বসার ঘর। আধুনিক সোফা, ফায়ার প্লেসের সঙ্গে হাতির পায়ের টুল, বাঘের নখের ফুল, ঝাড়বাতি, পার্শিয়ান কার্পেট সবই রয়েছে।

আদিত্য প্রশংসা না করে পারল না, বলল—আপনার পছন্দের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

ছত্তরপালের মুখে গর্বের একটি ছায়া ভেসে যায়। মুখে বলে—এ আর এমন কি ?

কিছুক্ষণ স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে কথা হবার পর হঠাৎ ছত্তরপাল জিজ্ঞেস করল—আপনি তো বললেন যে বোটানির ছাত্র, তবে এখানে কি গাছ গাছড়া সংগ্রহে এসেছেন ?

—না ঠিক তা নয়।

—আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে বলবেন না।

—আপত্তির কিছু নেই। আমি ইতিহাস ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু, তাই ছত্তরপাল এবং জুঝার সিং সম্বন্ধে জানার জন্য বীরেন্দ্রবাবুর কাছে এসেছি।

—পরীক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে ছত্তরপাল আদিত্যকে দেখে নিয়ে বলে, তার জন্য বীরেন্দ্রের কাছে কেন, আমার কাছেও আসতে পারেন। আমিও আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—নিশ্চয় আসব।

কথার রেশ টেনে ছত্তরপাল বলে, বীরেন্দ্রের মহফিলের দিন যেমন করে এসেছিলেন আমরা ভাবলাম না জানি কি হয়েছে। ওর ভাই হীরেন্দ্রের কোন খবর টবরই হয়তো নিয়ে এসেছেন।

কথা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হতো কিন্তু এই সময়েই ভৃত্য এসে খবর দিল নায়েব হরবংশ সিং এসেছেন। ছত্তরপাল উদার ভাবে বললেন—এখানেই নিয়ে এসো।

আদিত্য অবশ্য আশাই করেছিল যে হরবংশ আজ আসবেই। সেটা কখন তা অবশ্য জানত না, আর ছত্তরের বাড়িতেই যে দেখা করবে তাও ভাবে নি।

হরবংশ আদিত্যকে দেখে যেন থতমত খেয়ে গেল। অবশ্য অসম্ভব ধূর্ত ; মুহূর্তে মনের ভাব গোপন করে বলল—আরে আপনি এখানে ? আর ওদিকে হাজি সাহেব, চমনলাল···সকলে ভীষণ ভাবছে।

—কেন ? দিন দুপুরে কি আমাকে বাঘে খাবে।

—না তা নয়, রাজা বাহাদুর নেই···।

—আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।

সমস্বরে ছত্তর এবং হরবংশ বলে ওঠে—চলি কি! এটা কি কলকাতার শহর যে পা বাড়ালেই ট্রাম বাস। এখানে হয় পা না হয় ঘোড়া থাকতেই হবে।

আপনি কি ঘোড়ায় এসেছেন, হরবংশবাবু?

—না, আমি গাড়ি এনেছি, চলুন ওতেই যাবেন।

—কিন্তু আপনার তো এখানে কাজ আছে।

সামান্য কাজ, এখনই হয়ে যাবে।

কথা বলে হরবংশ পকেট থেকে একটা খাম বার করে ছত্তরপালকে দিয়ে বলল—দেখলেই বুঝবেন সব।

ছত্তর বলে—কবে, কাল না পরশু?

—সেটা পরে জানাব। তবে যা করব তা তাড়াতাড়িই করব। আজ উঠছি, মেহমানকে নিয়ে যাই।

ছত্তরপাল আদিত্যের দিকে তাকিয়ে বলে—বাঙ্গালীবাবু আবার আসবেন তো?

—নিশ্চয়ই আসব।

গাড়ি চলতে থাকে। দুজনেই নীরব।

কথা শুরু করে হরবংশ—ছত্তরপালের সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

—পথেই, রামসীতার মন্দিরের কাছে।

—কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—এই, আমি কেন এসেছি, কতদিন থাকব…।

—খুব সাবধানে কথা ব'লবেন, এখানে কেউই ভাল নয়, এটাই মনে রাখবেন, এমন কি আমাকেও বিশ্বাস করবেন না।

আদিত্য হেসে বলে- দেওয়ানজী, এখানকার মানুষের গতি প্রকৃতি জেনে আমার কি লাভ, আমি তো এখানে থাকতে আসিনি, কিম্বা কারোর সঙ্গে হৃদ্যতা জমাতেও চাই না। যে কাজে এসেছি সেটা করেই চলে যাব।

গাড়ি ততক্ষণে বীরেন্দ্রের প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। দেউড়ির কাছে হাজী সাহেব উদ্বিগ্ন মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ; গাড়ি আসতে কাছে এসে বললেন—আদিত্য বাবু, ওভাবে ভোর না হতে কাউকে কিছু না বলে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি।

এক কথা বার বার শুনে আদিত্যের বিরক্তি লেগে গিয়েছিল, বলল—দেখুন হাজী সাহেব, আমি তো এখানকার বন্দী নই ?

—না, না, ছি, ছি, সে কি কথা !

—তবে উচিত অনুচিতের কথা ওঠে কেন ?

—আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। চলুন আমার ঘরে, গল্প করা যাক।

—না, আজ থাক, অন্য কোনদিন।

—তবে তো সত্যিই আপনার রাগ হয়েছে।

—রাগের কি আছে।

—তবে চলুন।

—ঠিক আছে। চলুন।

—এই সময় হরবংশ এলো। বলল—আচ্ছা ঐ ব্যাপারের কোন কিনারা হলো ?

হাজী সাহেব প্রথমে বুঝতে পারেননি তাই প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার বলুন তো ?

ঐ যে, কে বা কারা আজ কেবলপ্রসাদকে গুলি করে পালিয়ে গেল না ? তাদের কথা ব'লছি।

—সত্যি কেবলপ্রসাদের ওপরও আবার মানুষের রাগ হয় ?

এবার হরবংশ দার্শনিকের মত বলে—সব স্বার্থ হাজী সাহেব। সম্পত্তিই সকল বিপত্তির মূল।

আদিত্য একটু যেন অবাক হয়ে বলে—কেবলপ্রসাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক যোগাড় করলেন কি করে ?

—মানুষ চেনা যে বড়ই কঠিন।

—তাই বলে ওই বোকা, ভালমানুষ পেটসর্বস্ব সেই লোকটারও স্বার্থ?

হরবংশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—হয়তো পেটই স্বার্থ! আপনারা কথা বলুন, আমি একটু কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে নিই।

কথা শেষ করে চলতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। হঠাৎ হাজী সাহেবের যেন কি মনে পড়ে গেল, ব'ললেন—আচ্ছা দেওয়ানজী, টায়ারের গুদাম সম্বন্ধে কি যেন শুনলাম?

হরবংশ চলার গতি থামিয়ে দিয়ে হাজীসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—সব ব্যাপারেই কিছু না কিছু উৎপাত তো থাকেই, সেইরকম আর-কি!

—কনফিডেন্সিয়াল কথা হলে ব'লবেন না। আমি ভাবছিলাম সাধারণ কোন গণ্ডগোল।

—না কনফিডেন্সিয়াল তেমন নয়, ঘটনাটা হচ্ছে কয়েকজন বাজে লোক ঢুকেছে, তাদের মতিগতি ভাল বলে মনে হয় না। এবার রাজা-বাহাদুর ফিরলেই ওদের তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রব।

—আচ্ছা তবে এখন কাজে যাই।

—হ্যাঁ যান।

হাজী সাহেবের ঘরে এলো ওরা। এই ঘরটাতেই প্রথমে আদিত্য ছিল। তেমনিই সাজান আছে ঘরটি, শুধু ফুলদানে রয়েছে একগুচ্ছ গোলাপ। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে চোখে পড়ল বেহালার একটি বাক্স।

আদিত্য সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে—বাজান বুঝি?

লজ্জিত হাসি হেসে হাজীসাহেব বলেন—বাজাই তো বটেই। ওটা আমার একটা নেশা। লোকের কত বাজে নেশা থাকে, মনে করুন সেই রকমই।

—কি বলছেন আপনি। এ যে বিদ্যাদেবীর দান, সকলের কি হয়? একদিন শুনব। ···হাজী সাহেব আপনি কোথাকার লোক?

ঘর ভরান হাসি হেসে তিনি বলেন—কোথাকার আর, ভারতের।

—সে তো বটেই, তবে এখন কোথা থেকে এলেন ?

—লক্ষ্ণৌ-এর দিক থেকেই আসছি। আদিত্য তোমাকে আমি আপনি ব'লব না, বয়সে অনেক ছোট।

—নিশ্চয়, এটা আমারই বলা উচিত ছিল।

—যাক শোন, পৃথিবীর যেখানেই থাক যখনই চ'লবে দেখে চ'লবে, ভেবে বলবে। মানুষ চেনা বড় কঠিন। সত্যি ব'লতে কি মানুষ নিজেকেই চেনে না। নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারে না...।

উপদেশ ধরনের কথাবার্তা শুনে আদিত্যের ক্লান্তি লাগছিল, তাই মাঝ পথে হাজী সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে বলে—সে কথা সত্যি।...আচ্ছা হাজী সাহেব, আপনি রোমাঞ্চকর কিছু করেছেন কখনও ?

—রোমাঞ্চ বলতে কি ভূতের কথা ব'লছ ? না শিকার খেলা, গুপ্তধন উদ্ধার ?

শেষের কথাটা শুনে আদিত্যের শরীরে শিহরণ জাগে, এও কি ঐ দলের নাকি ? মনের ভাব গোপন করেই বলে গুপ্তধনের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎ হয় না।

—সে আর কজনের হয়। আমিই কি কোনদিন ভেবেছিলাম যে স্বচক্ষে গুপ্তধন দেখব।

—এবার কাহিনী বলুন।

—কাহিনীই বটে। আমি কিছুদিন পর্যটক হয়ে ঘুরছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম চৌরাগড়ে। কোন নির্দিষ্ট যাবার তো জায়গা ছিল না, তাই যখন যেখানে মন যেত চলে যেতাম। এমনি একদিন শহরের বাইরে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে গিয়ে পড়লাম। মনে হয় না সেখানে নিত্যপূজার কোন ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের চারিধার দিয়ে বট, অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম শিবের মন্দির। এধার ওধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমের ঝুরি নেমে একেবারে মাটির মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট-

বেলার শোনা কথা মনে পড়ে গেল, আমের ঝুরি যেখানে নামে সেখানে গুপ্তধন থাকে।

কথাটা মনে উদয় হতেই কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে। শয়নে স্বপনে ঐ এক চিন্তা ওটাকে উদ্ধার করতে হবে। অথচ বিশ্বাস কর আদিত্য, আমার টাকার প্রতি কোন মোহ নেই। এক সময় ইচ্ছা ক'রে সব ছেড়ে ফকির হয়েছিলাম। পথ খুঁজতে লাগলাম।

একদিন দেখি কিছু কাঠুরিয়া মন্দিরের পাশ দিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছে। তাদের দেখে ভাবলাম আমিও কাঠুরিয়া হয়ে কাঠ কাটার নাম করে এইখানে গর্ত খুঁড়ব। তাই করলাম। দেখতে দেখতে দিন পনেরো কেটে গেল কিন্তু গুপ্তধনের দেখা পেলাম না। প্রায় যখন আশা ছেড়ে দিয়েছি তখন একদিন একটি ছোট ছেলে, কোথা থেকে এলো আর কোথায় গেল জানি না। হ্যাঁ যা ব'লছিলাম, একটি ছোট ছেলে আমার খোঁড়া গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে কি দেখল তারপর একটা নুড়ি তুলে সেই গর্তে ফেলল আর ঠং ক'রে শব্দ হলো। ধাতুর গায়ে নুড়ি লাগলে যেমন হয়।

ঐ শব্দটা আমার মনে উৎসাহ যোগাল। আমি আবার খুঁড়তে শুরু ক'রলাম। বেশী পরিশ্রম ক'রতে হলো না, একটা পেতলের ঘড়া দেখতে পেলাম। তারপর বহু কষ্টে সেটা তুললাম।

আদিত্য বলে ওঠে, আচ্ছা ওটা কি কেশব দেবের মন্দিরের অগ্নি কোণে ছিল?

কৌতূহলে চোখ দুটো নাচিয়ে হাজীসাহেব বলেন—আরে হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে?

আদিত্য তাড়াতাড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—না. আমি কিছু জানি না, তবে এক সাধু আমাকে গল্প বলেছিলেন···হ্যাঁ তারপর, তারপর কি হলো?

— তোমাকে কি বলব, সে যে কত ঐশ্বর্য! ভীষণ লোভ হ'লো

সবটা আত্মসাৎ করার, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, এ ধনে আমার তো কোন অধিকার নেই, খোঁজ করে যার জিনিস তাকেই দেবো।

—কোথায় রাখলেন অত সম্পত্তি?

হাজীসাহেব হো হো করে হেসে ব'ললেন—ব'লব কেন? একটু আগেই ব'লছিলাম না কাউকে বিশ্বাস ক'রতে নেই।

আদিত্য লজ্জা পেয়ে বলে—না, না, তা ব'লবেনই বা কেন, আমারই তো দোষ, অহেতুক, অশোভন কৌতূহল দেখান।

—তুমি বড় সিরিয়াস আর সেন্টিমেন্টাল। তোমাকে ঠাট্টা করলাম। গুপ্তধন যা পেয়েছি, তা সরকারের হেপাজতেই রেখেছি।

চমনলাল এলো। দুজনকে দেখে নিয়ে সে বলে—আজ কি সারাদিন গল্প করেই কাটবে? নাস্তার কি বন্দোবস্ত করব?

আদিত্য ব'লল—আমি কিছু খাব না, ছত্তরপালের বাড়ি অনেক খেয়েছি।

হাজী সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে—এবার যাই।

—অনেকক্ষণ তো ব'সে আছ, এবার তুমি ঘরে যাও।

ঘরে এসেও আদিত্যের আজ কিছু ভাল লাগছিল না। মিছামিছি সময় নষ্ট ক'রে লাভই বা কি? গুপ্তধন উদ্ধার ক'রতে পারলে তার নামও বেরবে না, অকারণ ঝামেলা নেওয়া। কোথা থেকে এক ধড়িবাজ হাজী সাহেব জুটেছে। বড় বড় কথা খাজানা পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রশ্ন মাথায় আসে—এত জায়গা থাকতে হঠাৎ চৌরাগড়ের কথা বলল কেন? তবে কি ঐ নক্‌শার কথা হাজী সাহেব জানে?

আদিত্য মনে করতে চেষ্টা করে তার চোখ যখন বাঁধা হয়েছিল তখন কি হাজী সাহেব ছিল?

আদিত্য ঠিক করল আর কিছু ভাববে না এ ব্যাপারে। ব্যাগ থেকে একটা থ্রিলার বার করে পড়তে লাগল।

অলস মধ্যাহ্ন—বিকেল কেটে রাত এলো। আদিত্য প্রতিজ্ঞার

কথা ভুলে গিয়ে ভাবল, আজ আর সে নীরব দর্শক হবে না। ছায়ামূর্তি দুজনকে আক্রমণ করবে।

আদিত্য রাতের আহার ক'রল। মুখর চমন আজ যেন বড় বেশী গম্ভীর। আদিত্যই প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার, তোমার শরীর কি ভাল নয়?

—না হুজুর, শরীর ভাল আছে, কিন্তু মনটা ভাল নেই।

—কেন, কোন খবর আছে?

—তা ব'লতে পারেন। আমার বন্ধুর শরীর খুব খারাপ। তাই···।

—আরে শরীর থাকলেই খারাপ হবে, আবার ঠিক হ'য়ে যাবে।

—সে তো ঠিকই। আচ্ছা হুজুর আমি যাচ্ছি। সাবধানে শোবেন, রাজাবাহাদুর নেই তাই ভয় হয়।

যথারীতি দরজা বন্ধ ক'রে আদিত্য কালমূর্তির আশায় পথের দিকে চোখ পেতে রইল। অপেক্ষা ক'রে ক'রে মাঝ রাত হ'য়ে গেল। আজ বোধ হয় আর আসবে না। আদিত্য ভাবল এবার শুয়ে প'ড়বে, ঠিক তখনই ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল। আজ কিন্তু দুটি নয়, একটি।

ভালই হ'য়েছে! আদিত্য দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ ক'রল। যখনই সে নির্দিষ্ট দরজার কাছে এলো তখনই আদিত্য পেছন থেকে মূর্তিটিকে চেপে ধ'রে, চাপা ধমকের স্বরে ব'লল —এই, তুই কে?

আক্রমণ সত্ত্বেও লোকটা কায়দা ক'রে পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই নিমেষে দরজা খুলে একটি কালমূর্তি বেরিয়ে এসে এক ঝটকায় তার হাত থেকে কাল বোরখাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আদিত্যকে এক ধাক্কা দিল। সে টাল সামলাতে পারল না, সপাটে পাথরের মেঝেতে প'ড়ে গেল। পড়ার আগে ওর মনে হ'লো, এই সেই গন্ধ, যা চিঠিতে পেয়েছিল।



জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল ও নিজের খাটে শুয়ে আছে।

আশ্চর্য! ও এলো কি করে? কে আনল তাকে?

জানালা দিয়ে মিঠে রোদ এসে প'ড়েছে। সকাল হ'য়ে গেছে। এখনই চমন চা নিয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল, দেখল গায়ে বেশ ব্যথা হ'য়েছে।

প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখল চমন চা নিয়ে ব'সে আছে। তাকে দেখে ব'লল—সাহেব আজ আপনার উঠতে এত দেরী কেন? শরীর ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ ঠিকই আছে, এমনি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—যাক্ নিশ্চিন্ত, আমি ভাবলাম অন্য কিছু, কারণ রোজ তো দেখি কোন ভোরে ওঠেন। আচ্ছা আজ চলি, অনেক কাজ আছে।

চমন চলে যাবার পর আদিত্য কিছুক্ষণ ঘরে বসে আগের রাতের কথা ভাবতে চেষ্টা ক'রল। বুঝল শত্রুপক্ষের সঙ্গে সে এবার মুখোমুখি নেমে প'ড়েছে। খুব সাবধানে না থাকলে মৃত্যু অনিবার্য।

উঠে পড়ে আদিত্য। দিন দুই আর বীর তালাওয়ের দিকে যাওয়া হয়নি, তাই ভাবল একবার দেখলে হয় ওখানকার অবস্থা কি?

নিচে নেমেই দেখল হাজী সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন—চমনের কাছে শুনলাম তোমার নাকি শরীরটা খারাপ হ'য়েছে।

—না, না, ও কিছু নয়, আজ উঠতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে, তাই।

সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হাজী সাহেব বললেন—কোথাও প'ড়ে গিয়েছিলে না কি? কপালের এক পাশ ফোলা দেখছি।

—হ্যাঁ, বাথরুমে পা পিছলে···।

—যাক কমের উপর দিয়েই গিয়েছে। অনেক সময় প'ড়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে।

আদিত্য দেখল ভদ্রলোক কথা ক্রমশঃ বাড়াবেনই। তাই ব'লল—যাই ও পাশটায় একটু ঘুরে আসি।

—চল না আমিও যাই।

নাছোড়বান্দা হ'য়ে তিনিও চললেন সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ নীরবে চলার পর হাজী সাহেবই কথা বলেন—ঐ বাড়ির কত ইতিহাস আছে, কত কিংবদন্তী আছে, সে আর কি ব'লব।

—আপনি কতদিন এখানে আসছেন?

—কতদিন আসছি? কথাটার মানে তো ধ'রতে পারলাম না।

আদিত্য লজ্জা পেয়ে যায়। বলে—আমি বলতে চাইছিলাম যে কবে থেকে আপনি এখানে আসছেন বা মিঃ সিং-এর সঙ্গে কবে থেকে আলাপ।

ছোট থেকেই এখানে আসছি।

হঠাৎ আদিত্যের মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়—তবে রানীমা আপনাকে চেনেন না কেন?

—তাঁর না চেনারই কথা, কারণ তাঁর বিয়ের পর থেকেই আমি এখানে আসিনি।

আদিত্য কোন কথা বলার আগে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করেন—রানীমা আমাকে চেনেন কিনা, এ কথা তুমি জানতে চাইলে কেন? রানীমা কি তোমাকে কিছু···

—না, না, তিনি আমাকে কিছু বলেননি, তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিন দেখাই হয়নি।

—তবে?

কি যে উত্তর দেবে আদিত্য সেটাই ভেবে পাচ্ছিল না হঠাৎ হরবংশ কোথা থেকে এসে প'ড়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল—আরে আপনারা এখানে, আমি খুঁজছিলাম।

—কী ব্যাপার? খুঁজছিলেন কেন?

হাজী সাহেব প্রশ্ন করেন।

—না, জরুরী কিছু নয়। তবে আমি একবার শহরে যাব, যদি কিছু দরকার থাকে তো নিয়ে আসতে পারি।

—আমার কিছু দরকার নেই।

আদিত্য হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা নায়েবজী, জয়পাল কোথায় গেছে ?

—আমি ঠিক জানি না।

—চমন ব'লছিল ও নাকি দরিদ্রজনের সেবা করে।

—তা করে বৈকি! জয়পালের সঙ্গে কিছু দরকার আছে ?

—তেমন বিশেষ নয়, মিঃ সিং ব'লেছিলেন যা প্রয়োজন তাকেই ব'লতে, সেজন্যেই আর কি···

—আপনার কি কিছু প্রয়োজন ?

—প্রয়োজন ব'লতে, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না, চ'লে যাব।

—আপনি পরদেশী, চিরদিন তো এখানে থাকবেন না জানিই, আর দু এক দিন কষ্ট ক'রে থেকে যান, রাজাবাহাদুর এলেই চ'লে যাবেন।

—তাই যাব। এবার আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

দুপুরের খাবার নিয়ে চমন এলো। আজও ওর প্রাণবন্ত ভাবটা নেই। যেন কে ফুঁ দিয়ে উজ্জ্বল আলোর শিখাটা নিভিয়ে দিয়েছে।

কথা আদিত্যই পাড়ে—চমনলাল, আজও তোমার মন ঠিক হ'লো না ?

—না হুজুর, আজকাল কেবল মনে হয় বুড়ো বয়সে হয়তো ভুল ক'রছি।

এ কথা কেন মনে হ'চ্ছে ? কি ভুল ক'রেছ ?

—সাহেব, নিজের আত্মাকেই বিশ্বাস ক'রতে পারি না। সর্বদা মনের মধ্যে ভাল আর মন্দের যুদ্ধ হ'চ্ছে।

—যাকে তুমি বিশ্বাস কর তাকে সব কথা ব'লে দাও না কেন, তাহ'লে সে তোমাকে ভাল পথ ব'লে দিতে পারবে।

—মনের জোর পাচ্ছি না, দেখি কি হয়।

থালা বাসন নিয়ে চমন চ'লে যায়।

বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে রাত্রের প্ল্যানটা ঠিক ক'রে নেয়। আজও যাবে, তবে ছায়ামূর্তির গায়ে হাত দেবে না, তাতে হিতে বিপরীত হ'চ্ছে। আজ বরং ছায়ামূর্তিরা ঘরে ঢুকে গেলেই আস্তে আস্তে গিয়ে ঐ দরজাটা বন্ধ করে দেবে, যাতে বেরতে না পারে। বোঝা যাচ্ছে ছুটি বা তিনটি দল এই নক্শার পিছনে আছে। এক দলকে ঘরে পুরে রাখলে নিচের দলটার সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ হবে।

বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা তো দরকার কিন্তু সমস্যা তো ঘন্টা বাঁধার। কি ক'রে বাঁধবে। শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাবল। ওর মনে হ'লো নিজেকে এখন খুব সাবধান হ'তে হবে, কারণ কাল ছায়ামূর্তির গায়ে হাত দিয়ে খুব ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছে।

যাক্, যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা ক'রে লাভ নেই বরং পরের ব্যাপারটাই যাতে ভাল ভাবে হয় সেটাই ভাবতে হবে।

তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন একটা কিছু ইঙ্গিত ক'রল। তার মনে হ'লো ছায়ামূর্তিদের সে ঘরে বন্ধ করার আগে তাকেই হয়তো কেউ ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে যাবে!

কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদিত্য ঘর থেকে বেরবার কথা ভেবে নিল।

প্রথমে ভাবল, খাওয়া হ'য়ে গেলে সে পাশ-বালিসকে জামা পরিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে রেখে নিজে কোথাও লুকিয়ে ব'সে থাকবে। পরে ভাবল তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না। সে নতুন লোক, এখানকার ঘরদ্বারের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়। মাঝখান থেকে ধরা প'ড়ে আরও কেলেঙ্কারী। তবে?

বেশ নিরাশ হ'য়ে পড়ে।

আবার চিন্তা। কিছুক্ষণ পরে উঠে বাথ রুমে যায় মুখে জল দিতে। সত্যি মাথাটা বড়ই গরম হ'য়ে গেছে।

এ্যাটাচ বাথ। বেসিনের কল খুলে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে হঠাৎ চোখে প'ড়ল মেথর আসার নীচু ছোট দরজাটা। ছিটকানি খুলে টানতে গিয়ে দেখল বাইরে থেকে বন্ধ।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখল। ছিটকানি খুলতেই দরজাটা খুলে গেল। আদিত্য খুব খুশী। বাইরের ছিটকানি খুলে ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিল।

যথা সময়ে খাবার খেয়ে আদিত্য শুয়ে প'ড়ল। রাত তখন বারটা হবে। দরজায় মৃদু টোকা প'ড়ল। আদিত্য সাড়া দিল না, তার মনে হ'লো যে, কোন লোক এসে খোঁজ নিতে চাইছে জেগে আছে কি না। কিছুক্ষণ সাড়া না পেয়ে, যে এসেছিল সে অতি সাবধানে দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে দিল।

এবার আদিত্য উঠে ফুটোয় চোখ রাখল। আজও বেশ দেরীতে অতি মন্থর পায়ে দু'টি ছায়ামূর্তি গেল।

তারা ঘরে ঢুকে যেতেই, বাথরুম দিয়ে আদিত্য বেরিয়ে গেল।

পা টিপে টিপে সেই জানালাটার কাছে গেল। কান পেতে শুনল, ঘরে যেন ধাতব কিছু টানা হচ্ছে। আদিত্য সেই শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনিটা টেনে দিল।

আদিত্য যেদিন ঘরে ঢুকেছিল, সেদিনই দেখেছিল, ঘরে মাত্র একটি দরজা আর জানলাগুলো ছোট ছোট এবং বেশ উঁচুতে। কাজেই চট করে কারোর ওখান থেকে লাফিয়ে পড়া সহজ হবে না।

পুরোনো বাড়ির শেষ প্রান্তে এল আদিত্য। আগেই দেখে রেখেছিল, ওখানে একটা সিঁড়ি আছে। বড় সিঁড়ি দিয়ে নামতে ভয় করল। কারণ দেউড়িতে অনেক লোকজন রয়েছে, কেউ যদি দেখে ফেলে, তবে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

ধীর পায়ে, সন্তর্পণে নেমে এল আদিত্য। এদিক-ওদিক দেখে বীর তালাওয়ের পশ্চিম পারে এল। যে পথে রোজ আসে, সে পথের বিপরীত দিক থেকে আজ আদিত্য চলেছে।

হঠাৎ মনে হল, ঘাসের ওপর দিয়ে কি যেন সরসর করে চলে যাচ্ছে। গায়ে কাঁটা দিল। এ আবার চমনের নাগদেবতা নয় তো। একটু দাঁড়াল। তারপর আবার সাবধানে পা ফেলে চলল।

অশ্বত্থ গাছটার কাছে এসে একটু নিশ্বাস নিল। সব দিক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রায় গাছের সঙ্গে লেগে দাঁড়াল। মনটা নিশ্চিন্ত হয়েছে —এমন সময় কে যেন সজোরে ওর মুখটা চেপে ধরল! ছাড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল সেই বড় আংটিটা।

চাপা গলায় বলল, ছটফট করে কোন লাভ নেই। আমার হাতে পিস্তল আছে। বরং যা বলি, তাই কর। আমি মুখ খুলে দিচ্ছি, কিন্তু চেঁচিয়ে লোক ডাকার চেষ্টা কোরো না, ফল ভাল হবে না।

মানুষ চেনার জো নেই, মুখোশ ঢাকা। এবার আদেশ এল, পাথরের চৌকিটা ধর।

ওটা ভীষণ ভারী।

আমিও ধরছি।

সে ডান হাতে, আর আদিত্য দু-হাতে ধরে বহুকষ্টে সেটা সরালো। একটা দরজা বেরোল। তাতে অদ্ভুত একটা তালা ঝুলছে। মুখোশ-ধারী একটা চাবি বার করে আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তালা খোলো।

ভীষণ অন্ধকার।

টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তালা খুলল। হঠাৎ আদিত্যর মুখ থেকে অসতর্ক ভাবে একটা কথা বেরিয়ে গেল ঃ চাবিটা আপনি কবে নিলেন ?

কেন, তুমি খুঁজছিলে নাকি ?

না, না, এমনিই !

ঠিক আছে, ভেতরে চল। সব কথা পরে জানতেই পারবে।

টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গ পথে দুজনে অনেক দূর গেল। তারপর একটা দরজা ! সেটা ভেতর থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।

মুখোশধারী বলে উঠল, এ দরজা তো বন্ধ হবার কথা নয়। তবে কি ওরা ওই পথ জানতে পেরেছে ? নিশ্চয় তাই ! চল, চল, তাড়াতাড়ি।

আদিত্য ভাবল, তার অবস্থা তো ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর।

বাঁচতে হলে একজনের সঙ্গে যোগ দেওয়াই উচিত। তাই বলল, দেখুন, আপনি কে আমি জানি না, তবে অনুমান কিছু করেছি। যা হোক, একটা দল ক'দিন ধরে ওপরের ঘরে কি করছিল, জানি না। আমার সন্দেহ হওয়াতে আজ তারা ঘরে যাবার পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। তাই তারা যদি বেরোতে যায়, তবে এ পথেই বেরোতে হবে।

এই কথা শুনে মুখোশধারী একেবারে উৎফুল্ল হয়ে আদিত্যর পিঠে আদর করে চাপড় মেরে বলল, বাহ্ বাহাদুর, বাহ্। যদি ওরা ধরা পড়ে, আর আমি প্রাণে বেঁচে থাকি তবে তোমাকে পুরস্কার দেবই। তুমি ঠিকই বলেছ, এই দরজা বন্ধ করাই উচিত। চল, এই দরজা, তার ওপরের পাথর সব বন্ধ করে দিই।

সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে পাথর চাপা দিয়ে আদিত্য যখন দাঁড়াল, তখন ভোরের হাওয়া বইছে।

মুখোশধারী বলল, চল, ওপরের ঘরটা দেখি।

ঠিক তখনই তীরবেগে বীরেন্দ্রর গাড়িটা ঢুকল। আদিত্য ভোর রাতে বীরেন্দ্রকে আশা করে নি। তবে গাড়িটা দেখে মনে জোর হল। তখনই আবার মনে হল, এইবার মুখোশধারী কি করবে ? বীরেন্দ্রকে গুলি করবে না তো ?

মূর্তি বলে উঠল, রাজাবাহাদুর এসে গেছে।

আপনি যাবেন ?

হ্যাঁ, যাব। তোমার কোন চিন্তা নেই, তাঁকে গুলি করতে যাব না, ধরা দিতেই যাব।

কথাটা শুনে আদিত্যর মনে হল, লোকটা কি হাত গুণতে জানে নাকি ? তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নি, মূর্তিকে এগিয়ে দিয়ে ও পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। পিস্তল তুললে, যাতে বাধা দিতে পারে।

হেডলাইট তখনও জ্বলছে! মূর্তি বলে উঠল, দাদা, কেমন আছ ?

হীরেন্দ্র! কেমন আছিস ?

আদিত্য অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবার বীরেন্দ্রর দৃষ্টি আদিত্যর ওপর পড়ে। বোঝেন যে, আদিত্য কিছুই বুঝতে পারছে না। বলেন, আদিত্য, এ আমার ভাই হীরেন্দ্র—যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।

এবার হীরেন্দ্র মুখোশ খুলে ফেলল।

আরে, আপনি হাজীসাহেব ?

হ্যাঁ, সেজেছিলাম। দাদা দেখ, এই ছেলেটি এত সৎ যে, বলার নয়—আর সাহসীও বটে। গুপ্তধন সন্ধানীদের ও পুরোনো মহলে বন্দী করে রেখেছে।

তাই নাকি ? কে তারা ?

জানি না, এখনো দেখা হয় নি। চল, আমরা সবাই মিলেই যাব।

যেতে যেতে দুই ভাইয়ে কথা হয়, আদিত্য শ্রোতা।

হীরেন্দ্র, তুই যে একবার জানালি আসবি, তারপর আর কোন খবর নেই। হঠাৎ কাল সন্ধ্যায় বিয়ে বাড়িতে এক বিশাল টেলিগ্রাম। আমি তো অবাক। ওরা তো ছাড়বে না। শেষে নানা টালবাহানা করে রাত্রেই বেরিয়ে পড়লাম।

চিঠি দেবার পর আসি নি কেন জান, গুপ্তধনের জন্যে। ওই

দলিলটায় আছে না, চৌরাগড়ে গুপ্তধন আছে। জান আমি মন্দিরের পাশে যেটা পোঁতা ছিল, সেটা উদ্ধার করেছি। প্রচুর হীরে, মুক্তো আর সোনা।

হীরেন্দ্র, তুই দলিলের কথা জানলি কি করে ?

আমাকে তোমরা টি-বি হয়েছে বলে ঝাঁসিতে রেখে দিলে। আমি সেখান থেকে পালালাম এক সন্ন্যাসী দলের সঙ্গে। হঠাৎ একদিন একটা নদীর ধারে জেলেদের জালে একটা টিনের কৌটা উঠল। খুলে দেখা গেল, ওই খাতাটা রয়েছে। মাঝিরা ফেলে দিয়ে চলে গেল। আমি তুলে নিয়ে পড়েই বুঝলাম, এ আমাদেরই বংশের। আর তাই ঘুরে ফিরে আমার হাতে এসেছে। টিনের বাক্সটায় দেখলাম, একটা কাপড়ে মোড়া বংশের চিহ্ন আংটিও রয়েছে। যাই হোক, ওই নিয়ে আমি ঘুরতে ঘুরতে জটাধারী বাবার সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন ওটা আমাকে দে, আমি লেখাগুলো আবার সব ঠিক করে দেব। ওঁর কাছে রেখে বললাম, আমাদের বংশের জিনিস, আমি বা আমার বংশের কাউকে ছাড়া এটা যেন অন্য হাতে না পড়ে।

উনি লিখতে শুরু করলেন। আর আমি হিমালয়ে চলে গেলাম। যাবার আগে যেটুকু পড়েছিলাম, তাই মনে করে করে চৌরাগড়ে গুপ্তধন পেলাম। জটাধারী বাবার কাছে গেলাম। তিনি তখন মারা গেছেন ; তবে একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে রেখে গিয়েছিলেন, ওঁর এক শিষ্যর কাছে। ওই চিঠিতেই সব জানতে পারি।

মাসখানেক আগে এসে সব কিছু লক্ষ্য করছি। কাজে একজন গোয়ালের হাবা লোক এসেছিল ; তাকে আমি পাঠিয়েছিলাম এই পথটা আগলাবার জন্যে। পরে চাবিটাও আমাকে এনে দিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ষড়যন্ত্রকারীরা ওকে মেরে ফেলেছে।

কথাটা শুনে বীরেন্দ্র চমকে ওঠেন, কবে ?

এই তো দু'দিন হল। ও মারা যাবার পর, আমি নিজেই পাহারায় থাকি, আমি তোমাকে টেলিগ্রাম করি।

কথা বলতে বলতে পুরোনো বাড়ির দরজার কাছে এসে পড়ে। হীরেন্দ্র বলেন, খুব সাবধান, দরজা খুললেই কিন্তু গুলি অথবা ছোরা চলবে, কারণ ওরা এখন মরীয়া।

একটু আওয়াজ করেই দরজার ছিটকিনি খুলে দরজার সামনে হীরেন্দ্র নিজের গায়ের কোটটা ধরল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হলো, কোন গুলি বা ছোরা এলো না।

হীরেন্দ্র এবার বজ্রগম্ভীর স্বরে ব'ললেন—গুলি বা অস্ত্র চালাবার চেষ্টা করো না, প্রাণ যাবে।

আবার অপেক্ষা।

কোন সাড়া শব্দ নেই! এবার তিনজনে এক পাশে সরে দরজাটা পুরো খুলে দিল।

না, কোন ফল হ'লো না। হীরেন্দ্র ব'ললেন, তোমরা এখানে থাক, আমি একবার দেখি ভিতরে কি হ'চ্ছে।

বীরেন্দ্র ব'ললেন—না, না, ও সব করার দরকার নেই, গেলে তুমি আর আমি দুজনেই যাব।

যখন এই রকম বাক্‌বিতণ্ডা চ'লছে তখন ছমরু ব'লে একটি ছোট ছেলে দৌড়ে এসে ব'লল—রাজাসাহেব, রাজাসাহেব, শিগ্‌গীর নিচে চলুন।

—কেন, কি হ'য়েছে ?

—এই ঘরের যে সিঁড়িটা আছে, মেথরদের সিঁড়ি, সেখানে কেবল-প্রসাদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না।

বীরেন্দ্র তাড়াতাড়ি সেদিকে দৌড়ালেন। হীরেন্দ্র চট করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন যাতে ঐ ঘরের লোকেরা পালাতে না পারে।

তারপর সবাই নিচে এলো। দেখল কেবলপ্রসাদকে খাটিয়ায় শোয়ান হয়েছে, তার জ্ঞান নেই, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরচ্ছে।

হাজী সাহেব দেখে বললেন—এ তো বিষ খেয়েছে কিম্বা সাপে কামড়েছে।

কথা শুনে সবাই তার দেহ পরীক্ষা করল। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক। এক পায়ে সাপে কামড়েছে, আর এক পায়ে বন্দুকের গুলির দাগ।

চোখে মুখে জল দিতে দিতে সে একবার তাকাল। তখন হাজী সাহেব প্রশ্ন করলেন—তুমি কোথায় ছিলে ?

সে আঙ্গুল দেখিয়ে ওপরের ঘরটা দেখাল। আবার প্রশ্ন—ওরা ওপরে আছে ?

মাথা নাড়ল—নেই।

—তবে ওরা কোথায় ?

অতি কষ্টে হাত দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল।

—পালিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—খাজানার সন্ধান কি পেয়েছে ?

এবারেও অতি কষ্টে মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

তারপর আস্তে আস্তে স্থির হ'য়ে গেল।

এই সময় চারিধারে হুইস্‌ল বেজে উঠল আর একটি ছোট ছেলে এসে জানাল পুলিশের গাড়ি এসেছে, অফিসার এসেছে—দেওয়ানজী ডাকছে।

ওরা সকলেই গেল বাইরে।

বসার ঘরে মাথা হেঁট করে জয়পাল ব'সে আছে, তার পাশে পায়ের কাছে চমন। অন্যান্য চেয়ারে পুলিশ অফিসার, হরবংশ বসেছে।

বীরেন্দ্রই প্রথম বললেন—কি ব্যাপার, আপনাদের সঙ্গে জয়পাল কোথা থেকে?

পুলিশ অফিসারটি একটি বিশাল থ'লে দেখিয়ে বললেন, জয়পাল সিং এটা নিয়ে পালাচ্ছিলেন আমরা তাই ধরে এনেছি।

হঠাৎ নাটকীয় ভাবে জয়পাল উঠে এসে বীরেন্দ্রের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ব'লল—আপনার স্নেহের ঋণ কি সুন্দর ভাবে চুকিয়েছি দেখছেন তো?

বীরেন্দ্র যেন ককিয়ে উঠলেন—একাজ তুমি কেন করলে? তোমাকে যে আমি বড় বিশ্বাস ক'রতাম।

—বিশ্বাস করুন প্রথমে আমি এমন মন্দ ছিলাম না কিন্তু গুপ্তধনের কথা জেনে আমি পাগল হ'য়ে গেলাম।

বীরেন্দ্র ব'ললেন, তুমি তো নক্‌শা জানতে শুধু, পথ তো জানতে না।

ঠিকই, আমি শুধু নক্‌শাই পেয়েছিলাম। তবু খুঁজতাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। এই সময় এলেন আদিত্য বাবু, জানলাম উনি সব জানেন। প্রথম দিনই ওনাকে শেষ ক'রে দিতাম কিন্তু চাবির জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

কথাটা শেষ হ'তেই আদিত্য জয়পালের হাতটা লক্ষ্য ক'রল। হ্যাঁ, রয়েছে সেই বিশাল আংটি।

বীরেন্দ্র এবার অধৈর্য হ'য়ে প্রশ্ন করেন—পথটা কে ব'লে দিলে ?

—দিদিটা তো ভালমানুষ, তার কাছ থেকেই দলিলটা নিয়ে প'ড়েছি।

পুকুর পাড়ে চাবি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, সেটা আগেই কে সরিয়ে নিয়েছে। লক্ষ্য রেখে দেখলাম হাবা চাকরটা ওখানে ঘোরাঘুরি করে। ওকে অনেক চেষ্টা ক'রলাম বশ মানাতে, কিন্তু কিছুতেই চাবির কথা ব'লল না। রাগের বশে মেরে ফেললাম।

সেই থেকে এই ঘরে খোঁজ চালিয়েছি। চাবি তো হারিয়েই গিয়েছিল, তা ছাড়া কোন কুলুঙ্গিতে দেবী মূর্তি থাকত তাও জানা নেই। প্রতি রাতে একটার পর একটা কুলুঙ্গি ভেঙ্গেছি। যত বিফল হ'য়েছি ততই জেদ চেপেছে। আজই ঐ পথটা খুঁজে পাই। খাজানায় নেমে আমি পাগল হয়ে গেছি। কী বিশাল তোশাখানা, কল্পনাও করা যায় না। পাছে অন্য দিক দিয়ে এসে কেউ নিয়ে যায় তাই ওদিকের দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম!

একটু আগে যখন চমন বেরতে গেল তখন দেখল দরজা বন্ধ। বুঝলাম আমরা বন্দী। হঠাৎ ঐ ঘোরান সিঁড়ির কথা মনে হ'তে ওখান দিয়েই পালাচ্ছিলাম। লোভের চোটে সব ছেড়ে আসতে পারিনি, থলে করে মণি মুক্তা ভরে নিয়ে পালাচ্ছিলাম। বোঝা উচিত ছিল যারা এত কাণ্ড করেছে তারা নিশ্চয় পুলিশেও খবর দিয়েছে। আসলে ভয়ে, উত্তেজনায় মাথার ঠিক ছিল না। ধরা প'ড়ে গেলাম।

—কেবলপ্রসাদকে সাপে কামড়াল কখন ?

—ঐ তোশাখানাতেই।

বীরেন্দ্র কাছে গিয়ে ব'লল—যা হবার হ'য়েছে, এবার থেকে ভাল হবার চেষ্টা কর।

জয়পালের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে ; বড় দেরী হ'য়ে গেছে, আমার শাস্তি আমি নিজেই নিয়েছি।

মানে ?

—আপনার সিন্দুক থেকে আপনারই আংটি চুরি করেছিলাম। জানেন তো ওটা বিষের কৌটা। তাতে বিষ রেখেও ছিলাম। জানতাম যে পিচ্ছিল পথে যাচ্ছি তাতে মৃত্যু আসবেই। তাই তৈরিই ছিলাম।

হাজী-সাহেব কখন যে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন কেউ খেয়াল করেনি। যখন তিনি ঢুকলেন তখন সবাই সমস্বরে ব'লল, যাক ডাক্তার এসে গেছে।

ডাক্তার দেখতে গেলে জয়পাল ব'লল, মিছামিছি কেন অপযশ নেবেন। আমি জানি এ বিষ খেলে কেউ বাঁচে না। আর সময় নেই। আমাকে ঠাকুরের নাম ক'রতে দিন।

তারপর আদিত্যের দিকে ফিরে ব'লল—ভাই, তোমার বয়স আর আমার বয়স একই হবে। তুমি নির্লোভ তাই কত সুন্দর করে বাঁচতে জান। ঈশ্বর যদি আমার কথা শোনেন তবে ব'লব ঠাকুর, যেখানে যত নির্লোভ মানুষ আছে তাদের ভাল কর।

এবার জয়পাল বীরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলে—জিজাজি, আমার পাপের শাস্তি আমি তুলে নিলাম। শুধু অনুরোধ চমনকে ক্ষমা করে দেবেন। সে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়নি, আমিই তাকে প্রলুব্ধ ক'রেছি।

আস্তে আস্তে জয়পাল চোখ বুজে নেয়।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর পুলিশ অফিসারটি বলেন—বড় করুণ ঘটনা ঘটে গেল। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি।

বীরেন্দ্র কাঁপা গলায় ব'ললেন—জয়পালকে যে আমি ছোট ভাই-এর মত ভালবাসতাম।

—জানি রাজাবাহাদুর। শুধু জয়পাল নয়, ক্ষতি আপনার অনেক দিক দিয়েই হ'চ্ছিল।

—কি ব'লছেন ?

—ঠিকই ব'লছি, রাজাবাহাত্বর, অনেক ভাগ্য ক'রে আপনি হরবংশ-জীর মত বিশ্বাসী লোক পেয়েছেন। উনি শুধু আপনার টায়ারের গুদামই বাঁচাননি দেশের শত্রু ছত্তরপালকেও হাতে নাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন থেকে ও বিদেশে দেশের মূর্তি চুরি করে পাচার ক'রত।

পুলিশ অফিসার কিছুক্ষণ থেমে ব'ললেন, এখন চলি। হরবংশজীই সব ব'লবেন।

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসু চোখে হরবংশকে প্রশ্ন করেন—কী ব্যাপার ?

—রাজাবাহাদুর, শুনেছিলাম ছত্তরপাল আপনার গুদামের টায়ার সরিয়ে নিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর এই কাজের জন্যে বেশ কিছু নিজের লোক ঢুকিয়েছিল গুদামের মধ্যে কুলি সাজিয়ে।

—তারপর ?

—আমি তখন ছত্তরপালের সঙ্গে এমন ব্যবহার করি যেন আমিও ওর দলের লোক। তার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে আপনার অসাক্ষাতে রানীমার কাছ থেকে আসল কাগজ চেয়ে ওকে দেখাই। বলি টায়ার বিক্রির টাকা আধাআধি ভাগ হবে। এর মধ্যে আমি পুলিশে খবর দিয়ে রাখি। পরের ঘটনা তো আপনি শুনলেন। এর মধ্যে বাড়িতেও একটা কিছু হ'চ্ছে আঁচ পেয়েছিলাম। প্রথমে হাজী সাহেবকে সন্দেহ ক'রেছিলাম। পরে একদিন ওনাকে দাড়ি খোলা অবস্থায় দেখে হীরেন্দ্র বলে চিনতে পারি। তখন বাড়ির ভার ওনার ওপরই দিই।

হাজীসাহেব তখন ব'ললেন—জয়পালের জন্যে দুঃখ হচ্ছে খুবই তবু এই দুঃখের আগুনে আমরা একজন খাঁটি সোনার দেখা পেলাম।

এই ব'লে আদিত্যর দিকে তাকালেন।

আদিত্য লজ্জিত ভাবে ব'লল—আমি সোনা কি না জানি না, তবে জুঝার সিং-এর গুপ্তধন যে অভিশপ্ত তা মানতেই হবে। তার প্রলোভনে কটা প্রাণ চলে গেল, আর সোনার দেখা আমিও পেয়েছি, যিনি সর্বদা আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

হাজী সাহেব হেসে বললেন, ওটা তো মানবিকতা।

॥ শেষ ॥